গণতন্ত্রের সঙ্কট

নির্মলকুমার বসু

মেরিট পাবলিশার্স
৫১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

আষাঢ় ১৩৭১

প্রকাশক
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মেরিট পাবলিশার্স
৫১, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭/৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

গভর্নমেণ্টে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে আমার কয়েকটি লেখা বন্ধুবর ৺সজনীকান্ত দাস এক সময়ে 'কংগ্রেসের আদর্শপ্রতিষ্ঠা' নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেগুলি ও পরে ১৯৬৭ সালের প্রথমাংশ পর্যন্ত লিখিত কিছু কিছু প্রবন্ধ মেরিট পাবলিশার্সের পক্ষ হইতে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একত্র প্রকাশিত করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাধারণ পাঠক বা নাগরিকগণ যদি এগুলির মধ্যে কিছু চিন্তার খোরাক পান তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

নির্মলকুমার বসু

গভর্নমেণ্ট এবং গান্ধীবাদ*

কয়েকদিন হইতে মনটা খারাপ হইয়া আছে। ছাত্রদের ভালবাসি, মানুষকেও ভালবাসিবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি দেখি সেই মানুষের উপর গুলি ছুঁড়িয়া অপরে তাহাদের হত্যা করিতেছে, তাহা হইলে কারণ যতই প্রবল হউক না কেন, মনটা খারাপ হইয়া যায়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ে পথে গুলি ছুঁড়িতে দেখিয়াছি। ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমানের উন্মত্ত আক্রমণের ফলে রাজপথ নিরীহ এবং হয়তো বা অপরাধী মানুষের দেহখণ্ডে ভারাক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। কলিকাতার পথে লোক নাই, পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদে শকুনের দল বসিয়া রহিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি। গৃহস্থ বিগলিত শবদেহের দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া পথের দিককার দুয়ার জানালা সবই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি।

পথে জনমানব নাই বলিলেই চলে, নিতান্ত প্রয়োজনে কেহ কেহ বাহির হইতেছে, হিংস্র মানবকুল পরস্পরকে চোরা আঘাত হানিবার জন্য সশস্ত্র অবস্থায় গলির ভিতরে, বড় রাস্তার মোড়ে কখনও কখনও দল বাঁধিতেছে। পুলিসের সশস্ত্র বাহিনী তীরবেগে সেখানে পৌছিয়া হয়তো দুম দুম শব্দে দু-চার বার গুলি ছুঁড়িয়া আবার দূরে মিলাইয়া যাইতেছে, ইহার সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি কারণে মুসলমান হিন্দুকে এবং হিন্দু মুসলমানকে হত্যা করিতে "বাধ্য" হয়, তাহা শুনিয়াছি। কি কারণে পুলিশ নিরীহ পথচারীকে রক্ষা করার জন্য অতর্কিতভাবে গুলি ছুঁড়িয়া অপর পথচারীকে হত্যা করিতে "বাধ্য" হয়, তাহাও শুনিয়াছি। ঐতিহাসিকের নিকট, রাজবিদ্রোহী স্বাধীনতাপ্রয়াসী বন্ধুবান্ধবদের নিকটে ইহাও শুনিয়াছি যে, স্বাধীনতার আবাহনে পথের ধূলি উড়িবেই, নররক্তে সেই ধূলি কর্দমাক্ত হইবেই। নূতন শিশু জন্মলাভের সময়ে যেমন রক্ত ও ক্লেদে মণ্ডিত হইয়া ধরার ক্রোড়কে প্রথম স্পর্শ করে, জাতির স্বাধীনতার জন্মমুহূর্তে তেমনই হয়, মানুষের ইতিহাসেরও ইহাই নাকি লিখন। ইহাকে কেহ রোধ করিতে পারে না; যে রোধ করিবার চেষ্টা করে সে বাতুল, স্বপ্নবিলাসী, পৃথিবীর ধূলিকর্দমের ভয়ে কাতর, বিপ্লবে তাহার স্থান নাই।

*শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৬। এপ্রিল ১৯৪৯ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

এ যুক্তি বারংবার বহু সুযোগ্য জ্ঞানী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি। তবু মন ভরে নাই। সংশয় থাকিয়া গিয়াছে। সত্যই কি স্বাধীনতার জন্য, তমসার নাশকালে রজঃশক্তির উদ্ভবের সন্ধিক্ষণে মানুষকে হত্যা করা ছাড়া পথ নাই? প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, পথ আছে। কিন্তু পথ রক্তশূন্য নয়। তিনি নূতনত্বের মধ্যে কেবল এইটুকু বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতার জন্য আমরা যে পথ রচনা করিব, তাহা প্রতিপক্ষের রক্তের দ্বারা রঞ্জিত না হইয়া সত্যাগ্রহীর নিজের রক্তের দ্বারা প্লাবিত হইবে। প্রতিপক্ষের রক্তের পরিবর্তে যে অপরকে আঘাত না করিয়া নিজের জীবনের মূল্য দিয়া অন্যায়ের প্রতিবিধান করে, সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের সৌধরচনা করিবার চেষ্টা করে, সেই হইল সত্যাগ্রহী।

এই ডাকের অমিত আকর্ষণে আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কংগ্রেস নামক ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গেল। সংগ্রাম চলিল। সত্যাগ্রহীগণ জীবন পণ করিলেন। যাঁহারা সত্যাগ্রহের ধর্ম স্বীকার করিলেন না, তাঁহারাও বীর্যের অমোঘ আকর্ষণে সত্যাগ্রহের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিপক্ষের রক্তপাতের পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের উৎসবে গান গাহিয়া অগ্রসর হইলেন। স্বাধীনতার চেষ্টা নূতন পথে চলিতে লাগিল। জগতের পটভূমিতে যে-সকল জাতি শক্তিশালী ছিল তাহারা দুর্বল হইল। যাহারা দুর্বল ছিল তাহারা সবল হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর গ্লানি মোচন করিয়া অকস্মাৎ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিল। ভারত দুর্বল ছিল, সবল হইল। তাহার নূতন যাত্রা শুরু হইল। সেই যাত্রার সন্ধিক্ষণে আজ আমরা সকলে বাঁচিয়া রহিয়াছি।

সমস্ত জগতে আজ বিদ্রোহ এবং বিপ্লব, দুঃখ এবং অসন্তোষ নানা আকারে ধূমায়িত হইতেছে। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও দুঃখের অন্ত নাই। বহু চেষ্টা, বহু নূতন ব্যবস্থার দ্বারা মানবের দুঃখকে মোচন করিতে হইবে। ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাধীন বিকাশলাভের জন্য সমাজের পক্ষ হইতে নানা আয়োজন করিতে হইবে। এই সন্ধিক্ষণে কর্মে কুশলতার প্রয়োজন, অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন; মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষের প্রতি, তাহার খাওয়া পরার দুঃখের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির প্রয়োজন। সেই সন্ধিক্ষণে আবার যদি দেখি, বোমা ছোঁড়া হইতেছে, পুলিশের পক্ষ হইতে গুলি চলিতেছে, মানুষের জীবনের

প্রতি মমতা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তবে মন তো খারাপ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। মানবজীবনকে মর্যাদাদান করিবার যে-শিক্ষা মহাত্মা গান্ধী দিয়া গিয়াছিলেন, বর্তমান সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, তাহা সমাধানের চেষ্টায় অধীর হইয়া আমরা মানুষের প্রতি সেই ভালবাসাকে হারাইয়া বসিব কেন? প্রতিপক্ষ যদি আঘাত করে, আমরাও কি প্রত্যাঘাত করিব? ধৈর্যের দ্বারা প্রতিপক্ষের দাবির মধ্যে সত্যাসত্য যদি কিছু থাকে, তাহা বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাকে কি জয় করিতে পারিব না? অন্ততঃ এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই তো গুরুদ্বারা অথবা ভাইকমে, ধরসানা অথবা তমলুকে সত্যাগ্রহীগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজ আমরা তাহা পারিব না কেন? গান্ধীজী আজ নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি নূতন যে রণকৌশল আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তো রহিয়াছে। সেই শিক্ষার উত্তরাধিকারের যোগ্য হইতে হইলে আমাদের আরও সাবধান, আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়।

* * *

গতকাল শুক্রবার ১৬ই বৈশাখ সংবাদপত্রে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি পাঠ করিলাম যে, বুধবার মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি যে মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তাহা রোধ করিবার সময়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ি হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সাত জন মৃতের মধ্যে দুইজনের দেহে পুলিশের গুলির দাগ ছিল, অবশিষ্ট পাঁচ জন বোমার টুকরার আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। পুলিস বোমা ছোঁড়ে নাই। মিছিলকারী এবং তাহাদের সমর্থকের দল বোমার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারগণের বিশ্লেষণ নির্ভুল হইলে বলিতে হয়, মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির সমর্থকদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অকাতরে নরহত্যা করিতে ইতস্ততঃ করেন না। হয়তো তাঁহারা মনে করেন, মানুষের মুক্তির জন্য এতদ্ভিন্ন আর পথ নাই। লেনিন সেইরূপ মনে করিতেন, মার্ক্স তাহাই মনে করিতেন, স্তালিন বহিঃশত্রু এবং সমাজের অভ্যন্তরে শত্রুনিপাতের জন্য হিংসার অস্ত্র ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অতএব, যে রাজনৈতিক কর্মীগণ উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়কে গুরুর পদবী দান করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে যে কোনও হিংস্র উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! আমাদের প্রশ্ন

হইল, সেরূপ ক্ষেত্রে অপরের কর্তব্য কি ? মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান কায়েম করিবার চেষ্টায় ভারতবাসীকে আঘাত করিল, তখন সাম্প্রদায়িকতার রূঢ় আঘাতে হিন্দুও অধিকতর সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিল। যে জাতীয়তার বোধ ধীরে ধীরে আমাদের দেশে দানা বাঁধিতেছিল তাহা সাম্প্রদায়িক ঝড়ের তাড়নায় নষ্ট হইয়া গেল। আসলে সাম্প্রদায়িক আঘাতের দ্বারা মুসলিম লীগ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিল। তেমনি যদি আজ কমিউনিস্ট মতাবলম্বী, হিংসাতে বিশ্বাসী মানুষের আঘাতে আমরাও হিংস্র হইয়া উঠি, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহের যে রণকৌশলে আমরা হাতে-কলমে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, তাহা যদি হেলায় ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের আচরণ স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে নবলব্ধ একটি সম্পদকে আমরা অসাবধান মুহূর্তে নষ্ট করিয়া ফেলিব। তাহার ক্ষমা আছে কিনা জানি না ; অন্তত সেইরূপ রত্নসম্পদকে নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এখন প্রশ্ন হইল, কমিউনিস্ট মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিকারব্যবস্থা কি হইতে পারে ? কমিউনিস্টগণ যথেচ্ছভাবে রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিয়া চলিবেন, পুলিশের প্রবর্তিত ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া চলিবেন, ইহা বলের দ্বারা প্রতিরোধ না করিলে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

গান্ধীজী প্রতিপক্ষের হৃদয়কে জয় করায় বিশ্বাস করিতেন। কমিউনিস্টগণও করেন। তবে তাঁহারা ভয়ের দ্বারা, শাসনের দ্বারা, অপরের শক্তিকে পরাস্ত করিয়া, তাহার মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করেন। গান্ধীজী বীর্যময় প্রতিরোধের কথা বলিতেন। এবং প্রতিরোধকালে সত্যাগ্রহীকে সর্ববিধ আঘাতের মধ্যেও অটল থাকিতে বলিতেন। সেই অটল বীর্য দেখিয়া প্রতিপক্ষের মনে বিস্ময় জাগাইবার চেষ্টা গান্ধীজী করিতেন। নিজের অত্যাচারের কোনও ফল না ফলিলে বিস্ময় জাগিবে ; তখন অত্যাচারী প্রতিপক্ষ সত্যাগ্রহীর সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই গান্ধীজীর আশা ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, মতলববাজ রাজনৈতিকদলের হৃদয় পরিবর্তন কি সম্ভব ? মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কি সফল হইয়াছিল ? কোনও মুসলমান নেতার হৃদয়কে কি গান্ধীজী সত্যাগ্রহের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা

দোষ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিবার কথা হইল এই যে, হয়তো প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু অপর পক্ষে সকল মানুষ সমান সাম্প্রদায়িক নহে। কেহ বেশি, কেহ কম। সেরূপ ক্ষেত্রে যাহাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি কম, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে সত্যাগ্রহের দ্বারা পরিবর্তিত করা সম্ভব। এবং তাহার ফলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ একা পড়িয়া যায় এবং কোণঠাসা হইবার ফলে নিজেদের দুর্বল বলিয়া মনে করে। নোয়াখালিতে মুসলমান জনতা যখন হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন নিরপেক্ষভাবে সকল মুসলমান তাহাতে যোগ দেয় নাই। অধিকাংশ লোক দিয়াছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু অধিকাংশের মধ্যে অনেকে লোভের বশে, প্রবল ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধের বশে সাময়িকভাবে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল কয়েকজনের ক্ষেত্রে মাত্র হিংসা স্থিরবুদ্ধিপ্রসূত ছিল। এবং এইরূপ মিশ্র হিংসার প্লাবনের সময়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে যাহা শুভ এবং সৎ, সেই শক্তি নিজেকে অতি দুর্বল বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। সম্মুখে অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং অন্যায়কে রোধ করিবার শক্তি তাহাদের নাই বলিয়াই তাহারা মনে করিয়াছিল। গান্ধীজীর নোয়াখালিতে অবস্থানের ফলে, নিরপেক্ষভাবে তিনি যেভাবে গ্রাম্য মানুষের সাংসারিক অবস্থাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার ফলে কুশলী দুর্বৃত্তের হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছিল, এমন কথা বলিব না। কিন্তু সমাজের শুভবুদ্ধি পূর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যেন জনসমূহ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া দানবপক্ষকে সমর্থন করিয়াছিল, তাহারা দেবতাদের খাতায় নাম না লেখাইলেও গান্ধীজীর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পুনরায় নিরপেক্ষ, শান্তিপ্রিয় মানুষের আকার ধারণ করিয়াছিল। সত্যাগ্রহের দ্বারা অন্তত এই ফল ফলিতে দেখিয়াছি। তদানীন্তন বাঙলায় কর্তৃপক্ষের এবং ভারত গভর্নমেন্টের মিলিটারী শাসনের ফলে সেরূপ ফল কেহ আশাও করিতে পারে নাই; অন্তত শুধু দন্ড এবং দমনের দ্বারা নোয়াখালি বা বিহারে স্থায়ী কল্যাণ আনা যায় নাই, ইহাও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

* * *

এবার কলিকাতার রাজপথে কমিউনিস্টগণের কর্মচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। কমিউনিজ্‌ম্ মানুষের মুক্তির চেষ্টা করে। কিন্তু সে মুক্তি শ্রেণী-সংগ্রামের রক্তাক্ত পথে ঘটিবে বলিয়া তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস! আজিকার ভারত

শাসনের ভার বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে, অতএব তাহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ যদি জিয়াইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কমিউনিস্ট বিপ্লব আরও দ্রুত আনা সম্ভব হইবে বলিয়াই বোধ হয় কমিউনিস্টগণ মনে করেন। বিশেষ করিয়া যখন পার্শ্ববর্তী চীন দেশে কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনীর জয়-জয়কার ঘোষিত হইতেছে, তখন ভারতে শ্রেণীসংগ্রামের দামামা বাজাইয়া রাখিতে পারিলে এখানেও বিপ্লবের আয়োজন আরও দ্রুতভাবে আনা সম্ভব হইবে বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন।

সেই চেষ্টার বশবর্তী হইয়া বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে কমিউনিস্টগণ কখনও শিয়ালদহ ইষ্টিশানে শরণার্থীগণকে উপলক্ষ্য করিয়া, কখনও কমিউনিস্ট বন্দীদের অনশনকে উপলক্ষ্য করিয়া পুলিশের ১৪৪ ধারা অমান্য করেন, গভর্নমেণ্টকে গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য করেন, শিশু এবং নারীহত্যা হয়, সাধারণ লোকও গভর্নমেণ্টের উপরে বিরক্ত হইয়া উঠে। ইহার পরে আবার যখন মিছিল বাহির হয়, আবার যখন ট্রামে আগুন লাগে, তখন গভর্নমেণ্টের পূর্বাচরণের ফলে বিরক্ত জনতা ভাবে, "যাক্ গে, বিধান রায়ের গভর্নমেণ্ট নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করুক, আমাদের ওসব কথা ভাবিবার দরকার কি?" কেহ কেহ গভর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের ব্যক্তিগত কারণ থাকার বশে হয়তো সাময়িকভাবে কমিউনিস্টগণের সহিত যোগ দেন, দুই-চারিটা ইট-পাটকেলও ছোঁড়েন।

কমিউনিজ্‌ম সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও যখন রাস্তার লোক গভর্নমেণ্টের বিপদকে নিজেদের বিপদ বলিয়া মনে করেন না, গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি নিজেদের সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন না, বরং কাহাকেও সে সম্পত্তি নষ্ট করিতে দেখিলে নিজে নিরপেক্ষ থাকেন, ইহার কারণ কি? তাঁহাদের আচরণের একটি মাত্র অর্থ হইতে পারে—গভর্নমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের আস্থা সক্রিয় নয়, সতেজ নয়। তাঁহারা কমিউনিজ্‌ম সম্বন্ধে অনুরাগসম্পন্ন না হইলেও গভর্নমেণ্টের প্রতি বিরাগসম্পন্ন হইয়া পড়েন, ইহাই হইল মূল কথা। এবং কমিউনিস্টগণ জনসাধারণের সুপ্ত অসন্তোষকে বা নিরপেক্ষতাকে যদি সুকৌশলে স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তবে তাহার জন্য "কুশলী রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের" দোষ না দিয়া বরং সমাজদেহে যে অসন্তোষ বর্তমান আছে, তাহারই আশু প্রতিকার করা প্রয়োজন। কমিউনিস্টগণ যদি ম্যালেরিয়ার মশা হন, তবে যে খানা

এবং ডোবায় গ্রাম ভরিয়া আছে, যাহার দুর্গন্ধে সারা আকাশবাতাস কলুষিত হইতেছে, সেগুলি দ্রুত পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে মশাও দূর হইবে, সমাজের পক্ষেও সুস্থ হইয়া ওঠা সম্ভব হইবে।

*

কয়েকদিন পূর্বে কালিম্পং হইতে সিকিম পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। একদিন পথে বর্ষার ফলে ধস নামায় আমাদের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে রাত্রিবাস করিতে হয়। পথটি যদিও সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তবু উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভারত গভর্নমেণ্টের উপরে ন্যস্ত আছে। কারণ ভারত এবং তিব্বতের ব্যবসায়-বাণিজ্য ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করে। পথের যে অংশে ধস নামিয়াছিল তাহা জনৈক রাজকর্মচারীর তত্ত্বাবধানে ছিল। যে দিন দুপুরে ধস নামিল, সেদিন হয়তো কুলিমজুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, পর দিবস সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এগারো জন কুলি শাবল, হাতুড়ি এবং ঝুড়ি লইয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত আমরা ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখি না। বহু ব্যবসায়ী ঘোড়ার পিঠে পশম লইয়া ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করে; বহু যাত্রী মোটরলরীযোগে সিকিম হইতে সেই পথ দিয়া ভারতে আসা-যাওয়া করে; সেই সকল যাত্রীর ঘোড়া এবং মাল প্রভৃত অসুবিধায় পড়িয়া গেল। অতি অল্পসংখ্যক কুলি যথাসাধ্য হাতের সাহায্যে কাজ করিয়া চলিল, কিন্তু কর্মচারীর দেখা আমরা পাইলাম না।

এই প্রসঙ্গে অপর একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরে আমার কথাবার্তা হয়। তিনি দেখিলাম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, কংগ্রেসের বড়কর্তাদের প্রিয়পাত্র হইলেই চাকরিতে উন্নতিলাভ হয়; অতএব এরূপ ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় কাজে কোনও উৎসাহ পা'ন না। চাকরি বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু না করিলে নয়, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার উৎসাহ তাঁহার হয় না। আর জেল খাটিয়া তাড়াতাড়ি কংগ্রেসী মহলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া লইবেন, তাহারই বা এখন সম্ভাবনা কোথায়? সে উপায়ও নাই। এই হইল সরকারী চাকুরিয়াদের মনোভাব, তাঁহাদের অবিচারের অনুভূতি, কাজে ঢিলা দিবার মূল কারণ।

ইহার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার সুযোগ সিকিমে অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করিতে সমর্থ হই নাই; কিন্তু রাজকর্মচারীদের মানসিক অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত

হইয়াছিলাম। গভর্নমেণ্টের কাজ যে এরূপ অবস্থায় অচল হইয়া যাইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে যাহা যাচাই করিতে পারি নাই, নিজে শিক্ষার জগতে কাজ করি বলিয়া গভর্নমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে অনুরূপ অবস্থার বেশী সন্ধান রাখি এবং যাচাই করিয়াও দেখিয়াছি, অনেক অভিযোগই সত্য। গভর্নমেণ্ট প্রতি বৎসর বহু টাকা শিক্ষাব্যাপারে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট আপিসের চিঠিপত্র বড় মন্থর গতিতে চলে। মার্চ মাসে গভর্নমেণ্টের আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে বৎসরের বরাদ্দ টাকা খরচ করিয়া দিতে হয়। এ বৎসর কোন কলেজে অকস্মাৎ চিঠি আসিয়া হাজির হইল, "তোমাদের এত টাকা দেওয়া হইল, দ্রুত খরচ করিয়া ফেল।" বিজ্ঞানের যন্ত্র মুড়ি-মুড়কির মত বাজারে পাওয়া যায় না; হঠাৎ অত টাকার যন্ত্র কিনিতে হইবে বলিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ এক কোম্পানির সহিত ব্যবস্থা করিয়া রসিদ দিলেন, যে অমুক অমুক মাল খরিদ হইয়া গিয়াছে। পেমেণ্টও হইয়া গেল। বস্তুতঃ মাল তখন পর্য্যন্ত ক্যাটালগের পাতায় আঁকা রহিয়াছে। পরে ধীরে ধীরে কি পাওয়া যাইবে না-যাইবে তাহা বিবেচনা করিয়া মাল খরিদ করিতে হইবে।

আর একটি ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কথা জানি। আচম্বিতে গভর্নমেণ্টের গুঁতায় পড়িয়া অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র হঠাৎ তাঁহাদের খরিদ করিতে হইয়াছে। ধীরে সুস্থে কিনিলে যাহা খরিদ করিতে পারিতেন, চাপে পড়িয়া খারাপ, এমন কি হয়তো অনাবশ্যক মালও তাঁহাদের কিনিতে হইয়াছে।

এরূপ হয় কেন? জনসাধারণের অর্থ লইয়া এরূপ অযোগ্য উপায়ে খরচ হয় কেন? যাঁহারা সাধারণের অর্থের এরূপ অপচয় ঘটিতে দেন, তাঁহারা নিজের বাড়িতে যে-সতর্কতা অবলম্বন করেন, সাধারণ তহবিলের বেলায় তাহার চেয়ে কম সতর্ক হন কেন? ইহার কারণ শুনিতে পাই যে গভর্নমেণ্টের মেশিনারিই এমন যে তাহার দ্বারা উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব হয়। সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বভাবতই স্বীয় প্রতিনিধিসদৃশ মন্ত্রীমণ্ডলীকে বলিবে, আপনারা উন্নততর মেশিনারি সৃষ্টি করুন, অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া কালোবাজারীদের সায়েস্তা করুন, অযোগ্য কর্মচারীর পরিবর্তে সুযোগ্য কর্মী নিয়োগ করুন, আমরা আপনাদের সমর্থন করিব।—কিন্তু সে চেষ্টা যে আপনারা করিতেছেন, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ তো আপনাদের দিতে হইবে।"

এই গেল শাসনযন্ত্রের দুর্বলতার কথা। আর শুধু শাসনযন্ত্র বা শাসক-

শ্রেণীকেই বা দোষ দিই কেমন করিয়া? সম্প্রতি এক জেলায় কয়েকটি গ্রামে গান্ধীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, যতজন কংগ্রেসকর্মী ছিলেন তাঁহারা সকলে লোহা, সিমেণ্ট, সূতা প্রভৃতি নানাবিধ রেশন-করা মাল নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করিবার গুরু দায়িত্ব নিজেদের দুর্বল স্কন্ধে বহন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, গ্রামের মান্য এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়া পঞ্চায়েত গঠন করিয়া তাহার হাতে এ দায়িত্ব দিলে তো ভাল হইত। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহাদের প্রসাদ-বিতরণে উৎসাহই বেশী, দেশে পঞ্চায়েত গঠনের দ্বারা গণতন্ত্র গড়িয়া তোলার উৎসাহ কম। একটি সহজ পথ বুঝি; অপরটি কঠিন পথ তাহাও বুঝি। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীগণ দেশকে গড়িয়া তোলার গুরুতর কাজকে ভয় পাইয়া যদি কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য লোহা সিমেণ্ট বিতরণের সহজ পথ আশ্রয় করেন, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রতি জেলায় পুরাতন কংগ্রেস-কর্মী রহিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা আছে; কিন্তু স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ে সকল বিষয়ে তাঁহারা যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন ইহা মনে করা নিতান্তই ভুল। অথচ নানা জেলায় শুনিতে পাই, কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পরিদর্শনে আসিলে কংগ্রেস-কর্মী ভিন্ন অবশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অনেক সময় পাশ কাটাইয়া চলেন। কোনও বাঁধ বাঁধিতে হইলে, ইস্কুল বা হাসপাতাল স্থাপনার ক্ষেত্র নির্বাচন করিতে হইলে, স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীগণের মতই তাঁহাদের নিকট অধিক সমাদর লাভ করে। স্থানীয় গভর্নমেণ্টের কর্মচারীগণও দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেসকর্মীগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টাই করেন। ফলে গভর্নমেণ্ট পরিচালনার কার্যে যে কী অসাধারণ ঢিলা ভাব পড়িয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে শুধু বিশ্বাসভাজন, জেল-ফেরত কংগ্রেস-কর্মীর উপরে নির্ভর করিলেই যে দোষের হয়, এমন কথা বলিতেছি না। কথা হইল, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে অনেক বিষয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের যোগ্যতাই নাই। শুধু চরিত্রের উৎকর্ষের দ্বারা মানুষের অপর অভাবকে পূরণ করা যায় না। সৎ হইলেও সময়ে সময়ে কুশলী ব্যক্তির পরামর্শের দ্বারা কংগ্রেস-কর্মীগণ পথভ্রষ্ট হ'ন, এবং সেই পথভ্রষ্ট অবস্থায় মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা সৎ-পরামর্শের বদলে অজ্ঞানতা-

বশতঃ অসৎ পরামর্শ দান করিয়া রাজকোষের অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থের অপচয়ের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী হন, ইহাও আমি ঘটিতে দেখিয়াছি।

একটি কাল্পনিক উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। এক শহরের বিস্তারের জন্য নূতন জমির প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্যও জমির প্রয়োজন। চাষীদের উন্নতধরণের বীজ সরবরাহের জন্য জমির প্রয়োজন। গভর্নমেণ্টের জমির দরকার, মন্ত্রী হয়ত স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জমি সন্ধান করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিলেন। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ বন্ধুবান্ধবদের স্মরণ করিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন "অমুক জমিদারের অনেক জমি শহরের পাশেই আছে, তাহা লওয়া যাউক।" আমরা তো জমিদারী প্রথার বিরোধী, অতএব জমিদারের যদি কিছু ক্ষতি সাধন করা যায়, তাহা হইলে উৎসাহী হওয়া বিপ্লবী কংগ্রেস-কর্মীর পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার বক্তব্য হইল যে, এই বিপ্লবের উৎসাহ যতই শুদ্ধবস্তু হউক না কেন, শহরের বিস্তারের জন্য, বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য এবং বীজের বৃদ্ধির জন্য কোন্ জমি সর্বোৎকৃষ্ট, অথবা সর্বাপেক্ষা কম খরচে কী ভাবে গভর্নমেণ্ট স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন, সে-বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য বিপ্লবীর উৎসাহ পর্যাপ্ত বস্তু নহে। হয়তো কোন জমিতে ৩০।৪০ বৎসরের বসতি রহিয়াছে, তাহাদের উৎখাত করিয়া বাস্তুহারাদের ঘর বসাইবার জন্য কংগ্রেস-কর্মী গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া বসিলেন। হয়তো খানিক নীচু জমি শহরের পাশে তিনি বাছিয়া দিলেন, পরে গভর্নমেণ্টকে সেই জমি মাটি দিয়া ভরাইয়া উঁচু করিয়া তবে শহরের বিস্তারসাধন করিতে হইল। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক বিনা চেষ্টায় দেখিলেন, শহরের বিস্তারের ফলে তাঁহার জমির দাম সোনার দামের মত বাড়িয়া চলিয়াছে।

এমন যদি হইত যে, গভর্নমেণ্টের যোগ্য কর্মচারীগণ সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ওইরূপ জমি বাছিয়া লইতেন, জমিদারের ক্ষতিসাধন করিতেন, এবং পরে পার্শ্ববর্তী উঁচু জমির দর বাড়িয়া গেলে সেই অতিরিক্ত টাকা ট্যাক্স করিয়া গভর্নমেণ্টের ভাণ্ডারেই তুলিতেন—অর্থাৎ কার্যতঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে আপত্তির কিছু থাকিত না। কিন্তু আজ সুদূরের

বিষয়ে পরামর্শ দিতে চা'ন অথবা যদি মন্ত্রীমণ্ডলী সেরূপ পরামর্শের দ্বারাই পরিচালিত হন, তবে গভর্নমেণ্ট যে সাধারণের অর্থ লইয়া অপচয় নিবারণ করিতে পারিবেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য।

কিন্তু ইহার অর্থনৈতিক ক্ষতি যাহাই হউক না কেন, রাজনৈতিক ফলাফল কি হয়, তাহাই আমাদের বিবেচনা করার দরকার।

জনসাধারণ অনুভব করিবে, কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের অর্থ লইয়া অপব্যয় করিতেছেন। তাহারা উত্তরোত্তর গভর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। এই বিশ্বাসের অভাব দুই ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে এবং পাইতেছেও। যেখানে ভোটের প্রশ্ন, সেখানে মানুষ কংগ্রেসকে ভোট না দিয়া অপরকে দিবে। অপর ব্যক্তি কে তাহা বিবেচনা করিবে না, তাহার রাজনৈতিক মতামত কি তাহা যাচাই করিবে না। কংগ্রেসকে ভোট দিবে না বলিয়াই অপরকে দিবে। ইহাই প্রথম ফল।

দ্বিতীয় ফল হইল, যে কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট টাকার অপচয় করিতেছে বলিয়া লোকের মনে ধারণা জন্মিবে, সেই কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডারে টাকাও কম আসিবে। মহাত্মা গান্ধীর নামে আজ যে-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা আচার্য কৃপালানি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই দুঃখ করিতেছেন, তাহাতে যথোপযুক্ত ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহা কংগ্রেসের প্রতি বৃদ্ধিশীল অনাস্থার ফল বলিয়া আমার মনে হয়।

*

কিন্তু মুক্তির উপায় কি? মুক্তির উপায় আছে।

কমিউনিস্ট প্রতিপক্ষ দেশের অসন্তোষ, রাজসরকারের অকর্মণ্যতা বা ঢিলামির সুযোগ লইয়া যদি স্বীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া অথবা তাঁহাদের রাজনীতির নিন্দাগান করা যথেষ্ট নহে। আসল কাজ হইল, যে অগণিত জনসাধারণ কমিউনিজ্‌মের পক্ষপাতী নহে, অথচ যাহারা বর্তমান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সঙ্গত অসঙ্গত কারণবশতঃ অনুরাগ হারাইয়াছে, এবং সেইজন্য বিদ্রোহী কমিউনিস্টগণের প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (স্বীয় নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা) সমর্থন করিতেছে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে হইবে যে গান্ধীজী যে সর্বকল্যাণবাদের বা শূদ্রতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কংগ্রেস সেই আদর্শ

প্রতিষ্ঠা করিবে ; এবং তিনি যে অহিংস উপায়ে সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, গণতন্ত্রসম্মত সেই উপায়ে কংগ্রেস সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেই করিবে।

স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, কংগ্রেস যখন রাজ্যশাসনভার লাভ করিয়াছে, তখন সর্বতোভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। সে সমাজে সর্বসাধারণের কল্যাণের দৃষ্টি অবিচল থাকিবে, অপর কোনও উদ্দেশ্য থাকিবে না। প্রতি জেলায় বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির সময়ে হউক, শিক্ষায়তন বা হাসপাতাল স্থাপনার ব্যাপারে হউক, চাষের বীজ অথবা সূতা লোহা বা সিমেণ্ট সরবরাহের ব্যাপারে হউক, কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট যোগ্যতম ব্যক্তির সাহায্য লইবেন, যোগ্যতমের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন, এবং যেখানে বিভিন্ন স্বার্থে দ্বন্দ্ব বাধিবে সেখানে দরিদ্রতম জনসাধারণের স্বার্থের নিকট অপরের স্বার্থকে বলি দিবেন। ক্ষমতাধারীগণ স্বীয় স্বার্থপুষ্টির চেষ্টা করিলে কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট এই চেষ্টা যদি করেন, তবে একদিনেই যে সব করিতে সমর্থ হইবেন তাহা নয়। ধনীকুল বহু কৌশলে গভর্নমেণ্টকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যদি গভর্নমেণ্ট স্বীয় আদর্শে অবিচল থাকেন তবে মাঝে মাঝে পরাজয় ঘটিলেও জনসাধারণ সেই গভর্নমেণ্টকেই সমর্থন করিবে, যে তাহার হইয়া লড়ে। চেষ্টা করিয়াও যদি মানুষ অপারগ হয়, সকলেই তাহাকে ক্ষমা করে। সেই চেষ্টা কিন্তু অবিচল থাকা প্রয়োজন।

১৯৩১ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

"কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ বলিতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে কাহারো যেন ভুল ধারণা না থাকে। যে কোটি কোটি জনগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অর্থনৈতিক জীবনে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আদর্শ। যে স্বার্থ দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী এবং যাহা শোষণের দ্বারা পুষ্ট, সেরূপ স্বার্থের সহিত কোন প্রকার অসাধু আপোস চলিতে পারে না…

"আমি এইবার আমাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে বলিব। আমাদের লক্ষ্য হইল, সর্বতোভাবে বিদেশী শাসন হইতে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ করা ; এই মুক্তি আজিকার মূক জনগণের জন্যই লাভ করিতে হইবে। যে-স্বার্থ তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল, সেই স্বার্থকে সংস্কার করিয়া জনগণের স্বার্থের অনুকূলে

পরিচালিত করিতে হইবে। যদি সেরূপ সংস্কার সম্ভব না হয়, তবে সে স্বার্থের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

[Let there be' no mistake as to what Purna Swaraj means to the Congress. It is full economic freedom for the toiling millions. It is no unholy alliance with any interest for their exploitation......

I will therefore state the purpose. It is complete freedom from alien yoke in every sense of the term, and this for the sake of the dumb millions. Every interest, therefore, that is hostile to their interest, must be revised or must subside if it is not capable of revision, —*Selections from Gandhi*, *290-291.*]

কংগ্রেস এবং গান্ধীবাদ*

কংগ্রেসকে পুনরায় গান্ধীজীর আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই জন্যই আজ লিখিতে বসিয়াছি। সাবধানী বন্ধুগণ বলিতেছেন, "সরিষার মধ্যে ভূত ঢুকিয়াছে, সে ভূত ছাড়াইবে কেমন করিয়া?" আমার বিশ্বাস, সে ভূত ছাড়াইবারও মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রের সাধনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কিন্তু রোগের চিকিৎসার পূর্বে রোগের প্রকৃতি এবং নিদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে যেমন চিকিৎসার সুবিধা হয়, সেইরূপ প্রথমে রোগ এবং রোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকের মন লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের পক্ষে দেখা আবশ্যক। "লজ্জা ঘৃণা ভয়, এ তিন থাকতে নয়।"—ইহা যে-কোন সৎ প্রচেষ্টার বেলাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

* * *

কংগ্রেস একটি বিশেষ কারণে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। মানবসমাজে অহিংস উপায়ের দ্বারা সকল ব্যাধির চিকিৎসা করিবার আদর্শ সে গ্রহণ করে নাই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে অন্য উপায়ে সংগঠনে সুবিধা হইতেছে না, অথবা যতটুকু বা গড়িয়া তোলা যাইতেছে, তাহাও বারংবার ব্রিটিশ শত্রুর প্রবল শক্তির আঘাতে পরাস্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়াই কংগ্রেস স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব এবং বীর্যের আকর্ষণই প্রবল ছিল, গান্ধীজী যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন, সে আদর্শের আকর্ষণ কংগ্রেসের নিকট কোনদিন প্রবল ছিল না। সেই জন্য কংগ্রেস লড়িয়াছে, কিন্তু গড়ে নাই। গড়ার কাজে, গঠনমূলক কর্মপন্থায়, তাহার আস্থা কার্য্যতঃ ছিল না। যতটুকু ছিল, তাহাও সংগ্রামের তাগিদে ছিল। অর্থাৎ গণসংযোগ স্থাপন করিয়া পরে সত্যাগ্রহের সময়ে বৃহৎ গণ-আন্দোলনের সুবিধা হইবে, এইরূপ ভাবিয়া অনেকে গঠনকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ বা দরিদ্র মানুষের মুখে দুটি অন্ন দিবার জন্য নিছক করুণাপ্লুত হৃদয়ে চরকা চালাইয়াছিলেন। সেইজন্য গান্ধীজী গঠন-কর্মের দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন,

---

* শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ / মে ১৯৪৯ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

গণতন্ত্র গড়িয়া তোলার যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আমাদের সহযোগিতায় তাহা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। সে আদর্শে ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভিন্ন কেহ গ্রহণ করে নাই।

এই অবস্থার মধ্যেও ভারতের নানা স্থানে গঠনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সমাজে তাহার প্রভাব সম্যক্ পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সমাজের জীবন সেরূপ প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়াই আপন পথে চলিয়াছিল।

সমাজের জীবন, মানুষের জীবন, নানা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের মানুষের জীবন মোটামুটি তিন শ্রেণীর ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথম হইল, রাষ্ট্র বা দণ্ডশক্তির আধারস্বরূপ শাসনযন্ত্র। দ্বিতীয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি নানাবিধ আধা-সরকারী অথবা বে-সরকারী সাধারণ প্রতিষ্ঠান। এবং তৃতীয় হইল, অনিয়ন্ত্রিত অথবা অল্পনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। দোকানী দোকান করে, ব্যবসাদার কেনাবেচা করে, রেল বা ষ্টীমার কোম্পানি লাভের জন্য গাড়ি চালায়, মানুষ তাহাতে পয়সা দিয়া যাতায়াত করে, ফলে আমদানি-রপ্তানি হয়। দেশের অর্থ লইয়া ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি নানাভাবে খাটায়, লাভ করে, ডিভিডেণ্ড দেয়—সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনও চলিতে থাকে। এই ভাবে তিন শ্রেণীর সরকারী, আধা-সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হয়।

ইংরেজী শাসনের সময়ে অর্থনৈতিক জীবনের কর্ণধারগণ সমাজের সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেন, সমাজের জীবন চলিত। কিন্তু চালক বা শাসকগণের লক্ষ্য ছিল, চালাইবার কালে কী ভাবে ইংরেজজাতির লাভের কড়ি বাড়াইতে পারা যায়, ইংলণ্ডের ভাণ্ডারে অর্থাগমের পথ কী করিয়া আরও সহজ করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে গোটা ভারতবর্ষ গৃহপালিত গাভীর মত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরেজ গরুকে খাইতে দিয়াছে সত্য, নয়তো সে দুধ দিবে কেন! কিন্তু গরুর দুগ্ধ এমন ভাবেই সে দোহন করিয়াছে যে কলিকাতার গোহাটার বাছুরের মত অনেক শিশু অনেক দুর্বল মানুষই অর্ধাহারে রোগে প্রাণ হারাইয়াছে। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছে, ভারতবাসীর বংশবৃদ্ধি বড় দ্রুত হয়, তাই দুর্ভিক্ষে লোক মরে। কিন্তু মানুষের গড় আয়ু যে ২৫ বৎসরে নামিয়া গিয়াছে, অন্নের অভাবে মানুষ মরিতেছে,

এবং এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতিদেবীর যে বিধান অনুযায়ী জীবজগতে জন্মের হার আস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সেই নিয়মের বশে চালিত হইয়াই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসী অত্যধিক জন্মের দ্বারা বংশরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, একথা তাহারা জানিয়াও স্বীকার করে নাই !

কিন্তু আজ সেই শোষণ এবং তজ্জনিত ভারতবাসীর দুঃখ ইতিহাসের কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের জীবন যে তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলি পূর্বে সর্বতোভাবে অধিকারগত ছিল বলিয়া স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণ যখন গড়ার কাজে মন দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বপ্ন দেখিলেন "সর্বতোভাবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়া, রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আমরা নূতন জীবনের বীজ বপন করিব। আশ্রম গড়িব, নিখিল-ভারত-কাটুনি-সঙ্ঘ গড়িব, তাহার দ্বারা সারা ভারতের বস্ত্রের অভাব মিটাইব। আর যদি দেখি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মারফত বস্ত্রের অভাব মিটানো যাইতেছে তবে চেষ্টা করিয়া পরে অন্নের অভাবও মিটাইব। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রসাদলেহী যত প্রকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারা থাক্ পড়িয়া এক দিকে, আমরা আলাদা চেষ্টার দ্বারা ক্রমে ক্রমে উহাদের অকেজো করিয়া দিব, শোষণমূলক সকল প্রতিষ্ঠান শুখাইয়া মরিয়া যাইবে।"

একটা উপমা দিই। হিমালয়ের কোলে শালের বন। নীচে পচা পাতায় মাটি উর্বর হইয়া আছে। পাথর ভাঙ্গিয়া নূতন মাটি হইতেছে। চারিদিকে বর্ষার বাহুল্য। ফলে, গাছ অসম্ভব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ সে গাছ আমরা চাই না, অন্য গাছের প্রয়োজন। আমরা ঠিক করলাম, "নূতন গাছের চারা আমরা লাগাইব। যতই কঠিন হউক, এইরূপ অনেক চারা লাগাইব। এবং ক্রমে আমাদের নূতন গাছের চারা এত বাড়িবে যে তাহার আওতায় এখনকার শাল প্রভৃতি অনাবশ্যক গাছগুলি শুখাইয়া মরিয়া যাইবে ; অবশেষে বনভূমিতে শুধু আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে স্থাপিত গাছই থাকিবে। সমাজজীবন শোষণবিহীন সহযোগিতামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়েই চলিতে থাকিবে। আজিকার রাষ্ট্র বা অপর শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার ঠেলায় মরিয়া শুখাইয়া যাইবে।"

* * *

কার্যতঃ তাহা ঘটে নাই। কিন্তু সেই স্বপ্নবিলাসীর ঘুমঘোর আজও কাটে নাই ; অথচ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের শাসনভার ইংরেজের

পরিবর্তে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আজ সেই যন্ত্রকে আমরা শোষণবিহীন সমাজরচনার উদ্দেশ্যে যদি পরিচালিত করিতে না পারি, অথবা যদি দেখি যন্ত্রের চালকগণ যন্ত্রকে বেসামাল ভাবে চালাইতেছেন, তবে হতাশ হইয়া যদি বলি "ক্ষান্ত দাও, আমাদের যন্ত্রে কাজ নাই, নিজের শক্তি অল্প, অতএব নিজের ক্ষমতা অনুসারে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া শুদ্ধতম আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব। তাহার বেশি আর মানুষে কি করিতে পারে?"—তবে বলিব, সেই কর্মীটি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন, কমঠবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন। আজ কমঠবৃত্তির অবসর নাই। আমরা আশ্রম গড়িয়া আত্মস্থ বা কূটস্থ হইবার চেষ্টা করিলেও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আদর্শের ব্যাপ্তি হয় কি করিয়া, প্রসার হয় কি করিয়া! ব্যাপ্তি ও প্রসারেই জীবন, সঙ্কোচনে মরণ।

আজ সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেগুলির মধ্যে প্রবেশ কবিয়া, সেগুলিকে বৃহত্তর মুক্ত জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে। ইহাই যেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। যে-যন্ত্র দিশাহারা হইয়া বর্তমানে চলিয়াছে যাহা পূর্বে ইংরেজ জাতির জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য চালিত হইত, তাহাকে আজ আমরা গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কি ভাবে ব্যবহার করিতে পারি, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বন্ধুগণ বলিতেছেন, "সরিষার মধ্যেই আজ ভূত, যন্ত্রের পরিচালকই আজ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা দুষ্ট। যন্ত্র পুরানো, অন্য উদ্দেশ্যে গঠিত। উহাকে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে, যন্ত্রের পরিচালক বদল না করিলে, কিছুই হইবে না, অতএব এস আমরা বিপ্লব করি। ভাঙ্গার কাজ শেষ হয় নাই। নিঃশেষে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া তবে গড়ার কাজে মন দিব।"

কিন্তু গান্ধীবাদী হিসাবে আমি মনে করি, সত্যাগ্রহের পথে গড়ার ভিতর দিয়াই ভাঙ্গা যায়। আজিকার রোগের দুরন্ত অবস্থায় জনসাধারণের উপরে সেই দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

নস্তবিহারী নস্কর পূর্বে একটি সামান্য দোকানে বাজার-সরকার ছিল। লোকটি ভাল। গ্রামে মড়া-পোড়ানোর কাজে দক্ষ, রোগীর সেবায় তাহাকে বাদ দিয়া কাজ চলিত না। সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন বাধিয়া গেল, তখন ঝোঁকের মাথায় একদিন নস্তবিহারী কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে পতাকা-উত্তোলনে

যোগ দিল। পুলিশ আসিল, দু-চার ঘা লাঠিও পড়িল, নন্তবিহারীর কেমন জিদ চাপিয়া গেল—সেও পুলিসের আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে যাইবে। জেল হইতে বাহির হইয়া নেতা হইল। যতবার আন্দোলন আসিয়াছে, নন্তবিহারী ততবার জেলে গিয়াছে। ভয়ে যখন লোকে কংগ্রেসের নাম শুনিলে সদরে দরজা দিত, নন্তবিহারী তখনও কংগ্রেস-অফিসে ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া চরকা কাটিয়াছে, প্রতি স্বাধীনতা-দিবসে ৫।৭টি অপরিপক্ব বালককে লইয়া স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য পাঠ করিয়াছে, মাথায় গান্ধীটুপি পরিয়া অহোরাত্র চরকা কাটিয়াছে। তখন কেহ ডাকিয়াও নন্তবিহারীর সঙ্গে কথা বলে নাই।

কিন্তু আজ ইংরেজ দেশে নাই; স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনভার কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নন্তবিহারীর আজ জয়জয়কার। লোকে তাহার কাছে ছোটে; রোগীর শুশ্রূষার জন্য নয়, মড়া পোড়াইবার জন্য নয়। নূতন একটি রেশনের দোকান বিশালাক্ষীতলায় না করিলে মানুষের ভারী কষ্ট হইতেছে। সেই দোকানের আবেদন লইয়া এক ব্যবসাদার ভদ্রলোক ঘন ঘন নন্তবিহারীর দরজায় ধরনা দিতেছেন। এদিকে নন্তবিহারী অন্য কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। রণভেরী দাস এক সময়ে বড় জমিদার ছিলেন; আজ অবশ্য তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেরা ইস্কুলের মাহিনা পর্যন্ত দিতে পারে না, সে কথা স্বতন্ত্র। দাসেদের বাড়ীতে কর্তামা মারা গিয়াছেন, শ্রাদ্ধ হইবে। শ্রাদ্ধে পাঁচ মণ ময়দার দরকার। ডিষ্ট্রিক্ট-রেশন অফিসার জমিদার-বাড়ীর মর্যাদার জন্য দেড় মণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাসের বাড়ীর পল্টু তাঁহাকে শাসাইয়া গিয়াছে, "আপনি কেমন পাঁচ মণ না দিয়া থাকতে পারেন দেখিতেছি।" বলিয়াই সে নন্তদার আশ্রমে ছুটিল। পল্টুর সঙ্গে নন্ত রেশন-অফিসে আসিয়া ঝুলাঝুলি লাগাইয়া দিল, পাঁচ মণ না দিলে মানী পরিবারের মান থাকে না। এ বাড়ীতে কখনও যাহা হয় নাই, সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। এ বাড়ীর ক্রিয়াকরণে গ্রাম্য ইতরভদ্রকে নিমন্ত্রণ না করিলে কখনও চলে?

নন্তর কাজের কামাই নাই, ফুরসৎ বলিতেও কিছু নাই। চোরাকারবারী এক ব্যবসাদার ধরা পড়িয়াছে। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় কাপড় লইয়া যাইবার পারমিট উদ্ধার করিয়া সে বাঙ্গলা হইতে বিহারে গোপনে সেই কাপড় পায়ে-হাঁটা পথে চালান দিতেছিল। দোকানীটি গত বৈশাখ মাসে গান্ধী-ফণ্ডে নগদ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, জেলার এনফোর্সমেণ্ট অফিসারের মেয়ের বিবাহে সে সস্তায় কাপড় দেয় নাই

বলিয়া তিনি পিছনে লাগিয়াছেন। নন্তু ন্যায় এবং সত্যের তাগিদে এই কেস লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ী রবিবার সকালে উপস্থিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট বাঙ্গালী হইলেও বিলাতফেরত আই-সি-এস। তিনি রবিবার এ বিষয়ে কথা বলিতে অস্বীকার করিলেন। ক্ষোভে নন্তুর চোখে জল আসিল। অথচ ব্যবসায়ী বন্ধুর সামনে ধরা দিল না। সোমবার সে পুনরায় সাহেবের অফিসে দেখা করিতে গেল। সাহেব ধীরভাবে সব কথাই শুনিলেন, কিন্তু বলিলেন, "এ বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের উপর ভার দেওয়া আছে, আপনি আর অকারণ মাথা ঘামাইতেছেন কেন?" ক্ষোভে ও অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া নন্তু ঠিক করিল, আর না, কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় মন্ত্রীমহলে —দাদা তাহার বিশেষ পরিচিত, একসঙ্গে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দেড় বৎসর পাশাপাশি কাটাইয়াছে। দাদার দীর্ঘ বক্তৃতা অনেকদিন শুনিয়াছে, তাহার এঁটো বাসন মাজিয়া দিয়াছে কাপড়ে সাবান দিয়া দিয়াছে, তাঁহাকে বলিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি করিতেই হইবে।

মন্ত্রীদাদার জন্য কিছু টাটকা মোরব্বা ও কদমা, মধুবানী হইতে আনা খুব মিহি ৯×৫২ খদ্দরের ধুতি একখানি লইয়া নন্তু কলিকাতায় যাত্রা করিল; গ্রাম-উদ্যোগের প্রদর্শনী দেখিতে সে ফাল্গুন মাসে মধুবানী গিয়াছিল। মন্ত্রীদাদা বেঁটে মানুষ হইলেও তাঁহার ৫২ ইঞ্চির কম বহরের কাপড় পরা চলে না; নন্তুর সব কথাই মনে থাকে।

মন্ত্রীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া আই-সি-এস মহোদয়ের সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে নন্তু তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া তাহার অপসারণ দাবি করিল। মন্ত্রী মহোদয় তাহাকে বুঝাইলেন, "ভাই, সরকারী কর্মচারীদের কাজে অনবরত তোমরা যদি হস্তক্ষেপ কর তাহা হইলে যে সরকারী কাজ অচল হইয়া যাইবে।"

কে কাহার কথা শোনে? নন্তু বলিল, "কংগ্রেস দেশে অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করিতে না পারিলে জনসাধারণ কাহার কাছে যাইবে?" তাহার মনের পিছনে রহিয়াছে, পাঁচ মণ ময়দা এবং ব্যবসায়ীর দেওয়া গান্ধী-ফণ্ডের ৫০০৲ টাকা। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশ হইতে টাকা তুলিতেই হইবে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পূর্ব্বের মত, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের মত সরকারী জুলুম চলিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ টাকা উঠাইবার কোন আশাই নাই। অতএব সুবিচার চাইই চাই।

মন্ত্রীদাদা দ্বিধায় পড়িলেন। নস্তুকেও চটানো চলে না। আগামী ইলেকশন আছে। তাহার উপর আবার বি-পি-সি-সির গোলমাল তো রহিয়াছেই। যদি নস্তু হাতছাড়া হইয়া যায়, বি-পি-সি-সি যদি অপর পক্ষের হাতে গিয়া পড়ে, তবে কতকগুলি চোট্টার হাতে দেশ পড়িয়া আরও উৎসন্নে যাইবে। অতএব নস্তুকে হাতছাড়া করিলে চলিবে না। তাহার দাবির সম্বন্ধে কি করা যায় ভাবিয়া দেখা যাক। ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি করা অবশ্য কিছুতেই চলিতে পারে না; কংগ্রেস-কর্মীদের পক্ষে পদে পদে এরূপ দাবি নিতান্ত অযৌক্তিক। আচ্ছা, অন্ততঃ চোরা-ব্যবসাদারের কেসটা এবার যাহাতে আর অনুসরণ করা না হয় তাহার জন্য একটি ডি-ও (ডেমি অফিসিয়াল লেটার) না হয় লিখিয়া দেওয়া যাক। অন্তত নস্তু এবার হাতছাড়া হইবে না। ছোঁড়াটা নিতান্ত বোকা, কেন যার তার কথায় যে নাচে! নস্তুকে হাঁকিয়া তিনি বলিলেন, "নস্তু, ভাই, কাপড়ের দামটা নিয়ে যেতে ভুলো না, আর আসছে বারে কিছু শতমূলীর মোরব্বা নিয়ে এস।" নস্তু যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, "সে কথা আর আমায় বলে দিতে হবে না দাদা।"

এইভাবে একটা অন্যায় অবিচার এবং জুলুমের প্রতিকার করিয়া নস্তু জেলায় ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমনই অবস্থার মধ্যে একদিন নস্তুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করছ নস্তু?" সে বলিল, "কি যে করছি দাদা, তা নিজেই জানি না। কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই।"

এইভাবে দেশের সরকারী কাজ চলিতেছে। চালের দর বাড়িতেছে, কাপড় পাওয়া যায় না, চোরাকারবারীরা যাবতীয় সুবিধা ভোগ করিতেছে। মানুষের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। আরামবাগ মহকুমায় এক চাষী সেদিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "গরু ইংরেজের আমলে অন্তত কিছু দুধ দিত, এখন যে তাও দেয় না।" নিষ্ঠাবান কংগ্রেসের এক কর্মী তাহাকে বলিলেন, "ভাই, আজ জগৎসুদ্ধ গরুরই ওই অবস্থা; কোন গরুই দুধ দেয় না।" চাষী বলিল "আচ্ছা, এবার রাখাল পালটে দেখি, কিছু দুধ বাড়ে কি না!"

কিন্তু আমাদের কথা হইল, রাখাল পালটাইলেই যে অপর রাখাল গরুর ভাল খোরাকের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ও ভাল দুধ পাওয়া যাইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তাই বর্তমান অবস্থাকে মানিয়া লইয়া, কি ভাবে সমাজের জীবনকে আবার সুষ্ঠুভাবে চালু করা যায় তাহারই একবার চেষ্টা করা যাক।

এবং কংগ্রেস-কর্মীগণকেই বা কি ভাবে আদর্শে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহার কৌশল সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক।

বৈশাখ মাসে দার্জিলিঙ গিয়াছিলাম। সেখানে গোর্খা-লীগের সম্পাদক জনৈক নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, যদিও তাঁহারা পূর্বে বাঙ্গালীবিদ্বেষ প্রচার করিয়া ভুল করিয়াছিলেন, তবু এখন মনে করেন যে, গান্ধীজীর প্রদর্শিত গণতন্ত্রের আদর্শই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেস-কর্মীগণ অলস, এবং অপরেও যে কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কিন্তু দৃষ্টি খুলিয়া গেল। মনে হইল, এই তো পথ রহিয়াছে। গান্ধীজীর আদর্শ যদি কোন প্রতিষ্ঠান না মানে, অথচ গান্ধীজীর নাম লয়, তবে তাহাকে সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে।

মানভূমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম সত্যাগ্রহ। এ সত্যাগ্রহেব উদ্দেশ্য ইহা নহে, মানভূমকে বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলার সহিত যুক্ত করা। সে বিষয়ে নিষ্পত্তির ভার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপরে ন্যস্ত আছে। কিন্তু মানভূমের লোকসেবক-সংঘ দাবি করিতেছেন ভারতের যে-কোন প্রদেশে, যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভিন্নভাষাভাষী অনেক ব্যক্তি থাকে, তবে সেখানকার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত—গভর্নমেণ্টকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য বা যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম সহকারে লোকসেবক-সংঘের কর্মীগণ যে পঞ্চায়েত গঠন করিয়াছিলেন, যাহার মারফৎ এতদিন রেশন এবং কণ্ট্রোলেব মাল সরবরাহ হইতেছিল, সেই পঞ্চায়েতকে বে-আইনি করিবার চেষ্টা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অন্যায়। সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এইরূপ গণতান্ত্রিক এবং নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত কয়েকটি দাবি বিহারের কংগ্রেসী গভর্নমেণ্টের দ্বারা স্বীকার করাইবেন বলিয়া মানভূমের সত্যাগ্রহীগণ কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এবং এই চেষ্টায় অপবের উপর আঘাত না করিয়া তাঁহারা নিজেদের উপরেই আঘাত আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বিষয়ে প্রচার করিতেছেন, জনমত সৃষ্টি করিতেছেন। এবং এখন প্রচারের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার জন্য যে বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, শুধু সেই অন্যায় আইনটিকে ভঙ্গ করিতেছেন। যদি প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়,

কিন্তু যদি গণতান্ত্রিক দাবিগুলি কার্যতঃ (অর্থাৎ শুধু মুখের কথায় নয়) স্বীকৃত না হয়, তবে তাঁহাদিগকে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অপর আইন ভঙ্গ করার বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে।

গোর্খা-লীগ এবং মানভূম সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বার বার আমাব মনে হইতেছে, পথ তো আছে।

* * *

সমাজে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন আজ রাষ্ট্র বা শাসনযন্ত্র এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চালিত হয়। ইহা ছাড়া বে-সরকারী কোম্পানি বা ব্যক্তিগত ব্যবসাদার, স্কুলমাষ্টার ইত্যাদির চেষ্টাও আছে। বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সংশোধনের কৌশলের বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

ধরুন, রেলগাড়িতে যাত্রা করিব। স্টেশনে গেলাম। সময়মত গিয়াও দেখি, বুকিং ক্লার্ক আছেন বটে, কিন্তু তিনি টিকিট দিতে দেরি করিতেছেন। জানালায় অনেক লোকের ভিড়, অথচ তিনি ট্রেন আসিবার আধ ঘণ্টার আগে জানালা খুলিবেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমি খাতায় হিসাব লিখছি দেখতে পাচ্ছেন না?" অথচ দেখিতেছি, তিনি অতি ধীর মন্থর গতিতে খাতা লিখিতেছেন। মাঝে মাঝে গত রাত্রে দৃষ্ট সিনেমার বিষয়ে অপরের সহিত গল্পও করিতেছেন। আমার পরিচিত কেহ, জানালা দিয়া নয়, দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলে, তাহাকে আগাম টিকিটও কাটিয়া দিতেছেন। দরজার উপরে কিন্তু লেখা আছে "প্রবেশ নিষেধ"। অর্থাৎ নন্তবিহারীর চাপে পড়িয়া মন্ত্রীদাদা যেমনভাবে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বুকিং ক্লার্কও তেমনই সদয় হইলে যাত্রীর টিকিট পূর্বাহ্ণে দিয়া থাকেন। সকলেই নিজের এলাকায় আজ ক্ষুদে মন্ত্রী বা লাট সাহেব হইয়া বসিয়া আছেন।

প্রতিকার কি? প্রতিকারের উপায় শুধু বুকিং ক্লার্কের হাতে তো নাই। যাহারা টিকিট কেনে, তাহাদের হাতেও আছে। টিকিট খরিদের জন্য যাত্রীগণ কেহ নিজের ব্যক্তিগত তাড়াতাড়ির কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাহার উপরে ঠিকমত টিকিট কিনিতে হইলে যে-জানালায় যাওয়া উচিত হয়তো অনেক সময়ে সেখানেও ঠিকমত যায় না। ফলে বুকিং ক্লার্কের মেজাজ আরও বিগড়াইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিকারপ্রয়াসী কর্মীর কর্তব্য হইল, তিনি জনসাধারণকে

সুনিয়ন্ত্রিত, সুশিক্ষিত করিয়া বুকিং ক্লার্কের বাজে কাজ অনেকখানি কমাইয়া দিবেন। যদি দরকার হয়, টিকিটের জানালার পাশে না হয় একটা বক্তৃতাই দিয়া বসিবেন, এবং সকলকে বলিবেন, "ভাইগণ, আপনারা সকলে লাইন ধরিয়া পর পর টিকিট কিনুন।" পয়সা-কড়ি ঠিকমত দেখিয়া তাহার পর টিকিট চাহিলে বুকিং ক্লার্কের সুবিধা হইবে, যাত্রীদেরও সুবিধা হইবে।" ইহাতে যে ফল হয়, তাহা যে-কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

অর্থাৎ যে-কোন কাজকে সহজ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে দুইটি পক্ষ আছে। কর্মচারীদের পক্ষ এবং জনসাধারণের পক্ষ। টিকিট কেনার ব্যাপারে যেমন জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তেমনই আমাদের আরও একটি গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। যাহারা সদর দরজা দিয়া "প্রবেশ নিষেধ" লেখা সত্বেও টিকিট কিনিতেছে, তৎক্ষণাৎ সেরূপ অভ্যাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। যে-ব্যক্তি ঐরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, নিজের আশু সুবিধার জন্য সে অপর যাত্রীর অসুবিধা ঘটাইতেছে। সকলের টিকিট কিনিবার সমান অধিকার থাকা উচিত। যে আগে আসিবে সে আগে কিনিবে, যে পরে আসিবে সে পরে কিনিবে। এ ছাড়া কোনও তারতম্য করা সঙ্গত নয়। যদি সে ব্যক্তি না শোনে, তবে বিলাতী-কাপড়-খরিদকারীর বিরুদ্ধে যেমন এক সময়ে পিকেটিং করা হইত, অথবা আফিঙ-খোরের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ পিকেটিং করিতে হইবে।

কংগ্রেস-কর্মীগণ নস্তুর মত জেলে আত্মীয়তার সুযোগ লইয়া যদি নিঃস্বার্থভাবেও কাহারও সহায়তা করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহার বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাকে জনসাধারণের নিকট নিষিদ্ধ দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইল—প্রচারের। প্রতি গভর্নমেণ্ট আপিসে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ চাহিব। তাহার জন্য আমরা লাইন দিয়া দাঁড়াইব, বাজে কাজে সময় নষ্ট করিব না। আপিসের মধ্যে বড়, মেজ অথবা সেজবাবু কে কাহার ভাগ্নে, ভাইপো বা মামা তাহা সন্ধানের পর সহজে কাজ বাগাইবার চেষ্টা না করিয়া, ঠিক সাধারণ প্রজা যেভাবে চলে সেই ভাবে লাইন দিয়া দাঁড়াইব। এবং যখনই কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবে, ধৈর্য না হারাইয়া সেরূপ অভ্যাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিব এবং শান্ত প্রতিরোধও করিব।

তাহা হইলে গভর্নমেণ্ট আপিসে আজ আনাড়ী অথবা ক্রুত ন্যায়বিচারে

উৎসাহী কংগ্রেস-কর্মীদের দ্বারা যেমনভাবে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতিকার হইবে। সহজ-জীবনের গতি আর একটু সহজ, হয়তো বা আরও একটু দ্রুত হইবে।

ইহাই সত্যাগ্রহের প্রথম কৌশল; সরকারী আপিসগুলিকে ঠিকমত চালাইবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সহযোগিতার শিক্ষালাভ করা এবং অভ্যাস করা। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে জনমত সৃষ্টি করা ও শান্ত প্রতিরোধ করা।

কিন্তু ইহা হয়তো পর্যাপ্ত নহে। রোগের মূল যেখানে, সেখানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নানাবিধ দোষ ঢুকিয়াছে। যদি মূল রোগের উৎস পূর্বের মত থাকিয়া যায়, তবে বাহিরের জীবনে আমরা সংশোধনের চেষ্টা করিলেও ফল স্থায়ী হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নূতন নূতন বিষ অনবরত সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া সাধারণ মানুষের জীবনকে এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকাকে আবার অচল করিয়া দিবে।

মূল রোগই বা কি? তাহার প্রতিকারই বা কি?

ক্ষতের চিকিৎসার চেষ্টা করিলে পুঁয ঘাঁটিতে হয়। কিন্তু পুঁয ঘাঁটায় আনন্দ নাই; রোগীর স্বাস্থ্য সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইয়া চিকিৎসককে নোংরা কাজও করিতে হয়।

বাঙ্গলা দেশ হইতে একটু দূরেই যাওয়া যাউক। উদাহরণের আঘাতে যেন কাহারও মন তিক্ত না হয়, সেই জন্য ঘরের রোগীর কথা না বলিয়া পরের ঘরের কথা বলিতেছি।

গান্ধীজীর চরকার আন্দোলনে অনেকে সাড়া দিয়াছিলেন। তিনি জীবনের শেষের দিকে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক জায়গায় তাহা গড়িয়াও উঠিয়াছিল। তাঁহার কল্পনা ছিল, দেশে পঞ্চায়েতরাজ স্থাপন করিবেন। সে পঞ্চায়েতরাজ আইনের দ্বারা তাঁহার জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরেও কয়েকটি প্রদেশে গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু গড়িয়াছে কি? গান্ধীজীর প্রবর্তিত অর্থনীতির মূল ছিল বিকেন্দ্রীকরণে। তিনি শুধু উৎপাদনযন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ চাহিতেন না, উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ চাহিতেন। কিন্তু ইহার অর্থ আমরা ভাবিয়াও দেখি নাই, কার্যতঃ যাহা গড়িয়াছি তাহা কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত

বিকেন্দ্রীকরণ। জমিদারবাড়ীতে সন্তান জন্মিয়াছে। হিন্দুস্থানী দরোয়ান ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে ; স্ত্রী বলিতেছে, "লড়কী ভৈল"। দরোয়ান বলিতেছে, "নহি, লড়কা ভৈল"। কিন্তু স্ত্রী হার মানিতে নারাজ। অবশেষে দরোয়ান বাধ্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা তুহারি বাত। লড়কীকে মাফিক লড়কা ভৈল।" আমাদেব বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টাও তেমনই হইয়াছে। এবং ইহার ফল কি দাঁড়ায়, তাহাব একটি উদাহরণ দিতেছি।

এক প্রদেশে চরকার কাজে উৎসাহী কয়েকজন কর্মী এক জায়গায় বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরীক্ষায় নিয়োজিত আছেন। জনসাধারণের নানা দুঃখ, তাহার মধ্যে কেরোসিনের অভাব একটি। চবকার কর্মীদের কাছে লোকে আসে। দুঃখের কথা বলে। ইতিমধ্যে নন্তবিহারীর মত এক ব্যক্তি সদরে গিয়া সরবরাহ মন্ত্রীদাদাকে ধরিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক চতুর ব্যবসাদারকে কেরোসিনের লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। সে ব্যক্তি কালোবাজারে তেল বিক্রয় করে, গ্রামের সাধারণ লোক তেল পায় না। প্রতিকারের চেষ্টা দুই-একবার চরকার কর্মীগণ করিয়াছেন। কিন্তু কেরোসিন-ওয়ালার খুঁটির জোর আছে বলিয়া কোন ফল হয় নাই।

ফল একেবারে হয় নাই বলিলে ভুল হয়। মন্ত্রীদের মধ্যে একজন নিখিল-ভারত-চরকা-কেন্দ্রের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কিছুদিন পরে দেখা গেল, চরকার কর্মীগণ কেন্দ্রস্থ পরিচালকমণ্ডলীব নিকটে খামকা তিরস্কাব লাভ করিতেছেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ম ঠিকমত করিতেছেন না, এরূপ অভিযোগের উত্তর তাঁহাদের নিকট তলব করা হইল। ইতিমধ্যে মন্ত্রীমহাশয় একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক বিরাট সভা করিয়া গেলেন। গভর্নমেন্টের খরচে মাইক বসিল, রামধুন গান হইল, "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম সবকো সম্মতি দে ভগবান" গান গাওয়া হইল, তুমুল উৎসাহের মধ্যে গান্ধী-ফণ্ডে চাঁদার জন্য বক্তৃতা হইল। কেরোসিনের তেলওয়ালা—যাহার মোটরে মন্ত্রীমহোদয় আসিয়াছিলেন এবং যাহার বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষভাবে গৃহস্বামীকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন—সে ব্যক্তি ফণ্ডে নিকেলের নগদ এক হাজার এক টাকা খদ্দরের থলিতে সভার মাঝখানে দিয়া বসিল। কংগ্রেসের জয়জয়কারে দিক বিদিক ভরিয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যায় মন্ত্রীমহোদয় গান্ধীজীর আদর্শপ্রণোদিত হইয়া বহুমুখী সমবায় সমিতির ভিত্তি স্থাপন করিলেন, কেরোসিনওয়ালা তাহার সভ্য হইল, দলীয় জনৈক শহরবাসী কংগ্রেসকর্মী তাহার সম্পাদক নির্বাচিত

হইলেন। চরকা-আশ্রমের কর্মীগণ নীরবে বসিয়া সবই দেখিলেন। দলগত স্বার্থপুষ্টির জন্য মন্ত্রীদের প্রচেষ্টাকে দূর হইতে দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন।

শুধু এক প্রদেশে নয়, প্রদেশের পর প্রদেশে দেখিয়াছি, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নয়, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক বিভিন্ন পার্টি কখনও গান্ধীজীর আদর্শের নামে বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্র খুলিতেছে, কখনও কর্মীদের দ্বারা কেন্দ্র স্থাপন করাইয়া শুধু একখানি সাইন-বোর্ড ও একজনের মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। এবং বুনিয়াদী শিক্ষাও অগ্রসর হইতেছে না, দেশ হইতে অস্পৃশ্যতাও দূর হইতেছে না, চরকাও চলিতেছে না; এই সকল কাজের নাম করিয়া কিছু কর্মীর আর্থিক আমদানি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের পোষণকারী রাজনৈতিক উপগোষ্ঠির প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও ভবিষ্যতে ভোট-সংগ্রহের আয়োজন চলিতেছে।

এইরূপ ক্ষমতালিপ্সা এবং গান্ধীজীর নামে নানা প্রতিষ্ঠানের এবং জগতের সর্বোত্তম আদর্শের ব্যভিচারের প্রতিকার কি? যদি ইহার প্রতিকার করা না যায়, তবে যতদিন সমাজের সরকারী ও বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাভার এইরূপ কংগ্রেস-কর্মীদের হাতে থাকিবে ততদিন দুঃখের অন্ত নাই। কংগ্রেসকে শাসনভার হইতে সরাইয়া, অথবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত শাসনের কোন সম্পর্ক না রাখিতে পারিলে হয়তো প্রতিকার হয়। কিন্তু তদপেক্ষা ভাল হয় যাহারা মুখে গান্ধীজীর আদর্শ স্বীকার করে, কিন্তু মনের অলসতাবশতঃ অন্ধভাবে গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করে, যদি জনসাধারণ অন্ততঃ তাহাদের সংস্কারের যথোচিত ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিতে পারে। জনসাধারণকেও গান্ধীজীর মত জীবন্ত, সর্বদা অগ্রগামী হইতে হইবে।

গান্ধীজী নিখিল-ভারত-চরকা-সংঘ, কস্তুরবা-স্মৃতিভাণ্ডার প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজের কী রূপ হইবে সে সম্বন্ধে প্রথমে প্রচারের প্রয়োজন। এবং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেখানেই সেই আদর্শে বিশ্বাসী, পরিশ্রমপরাঙ্মুখ নয় এমন কর্মী পাওয়া যাইবে, সেখানে বুদ্ধিযুক্ত স্থানীয় চেষ্টার দ্বারা কাজের পত্তন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, গভর্নমেণ্ট আপিসে, রেলে, ষ্টীমারে, শিক্ষালয়ে যেখানে গণতন্ত্রবিরোধী কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, সেখানেই তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এবং এইরূপ সক্রিয় চেষ্টার দ্বারা যে শক্তি জন্মিবে নূতন কর্মীগণ সেই শক্তিকে

সংহত করিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিভিন্ন লোকসেবামূলক প্রতিষ্ঠান-গুলিকেও সংশোধিত করিবার দাবি করিবেন। উপর হইতে স্থানীয় গঠনকর্মীর সাহায্য যদি ইহার ফলে বন্ধ হইয়া যায়, তবে মুষ্টিভিক্ষার দ্বারাও স্থানীয় অর্থভাণ্ডার গড়িয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে চালাইতে হইবে। প্রতিষ্ঠান যাহাতে স্বীয় সেবার উদ্দেশ্য, গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী পরিপালন করিতে পারে তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি মনে হয়, সেগুলি রাজনৈতিক উপদল-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে, তবে সে উদ্দেশ্য যাহাতে সফল না হয়, ইহার জন্য অসহযোগ এবং শান্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন উপায়ের দ্বারা জনসাধারণ তাহা করিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সকলকে চিন্তা করিতে হইবে।

মানভূমে সত্যাগ্রহীগণ যেমন কংগ্রেসী গভর্নমেণ্টকে গণতন্ত্রের নীতি স্বীকার করাইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন, তেমনই আমাদিগকেও যাবতীয় কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান যাহাতে গান্ধীর আদর্শ ঠিকমত মানিয়া চলে, ইহার জন্য যথোপযুক্ত প্রচার এবং নূতন প্রচেষ্টা, এমন কি প্রয়োজন হইলে সত্যাগ্রহ পর্যন্ত অগ্রসর হইবার দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহের দ্বারাই বিভ্রান্ত "সত্যাগ্রহীদিগকে" সুপথে আনয়ন করিবার জন্য দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে প্রচার এবং সত্যাগ্রহের নূতন নূতন পথ খুঁজিতে হইবে। যাঁহারা অহিংস উপায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহারা আজ এমনই একটি অবস্থা এবং দায়িত্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না। সে দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে হিংস্র ভাঙ্গা-চোরার ভিতর দিয়া শেষে কোন্ আঘাটায় যে আমাদের তরণী গিয়া ভিড়িবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

জনসাধারণ এবং গান্ধীবাদ*

সাধারণ মানবচরিত্র ও কমিউনিজ্‌মের বিপ্লবপন্থা

দেশের চৌদ্দ আনা লোক একটু সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চায়। ১৯৪৭ সালের পনেরোই অগস্টের পর তাহারা আশা করিয়াছিল, দেশের শাসন-ব্যাপারে এবং প্রতিদিনের জীবনে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিবে। কিন্তু আজ ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ইংরেজের শৃঙ্খলপাশ মোচনের পর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল, এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বড় রকম কোনও পরিবর্তনের প্রমাণ পায় নাই। চাল পূর্বের মতই দুষ্প্রাপ্য ও কঙ্করময়, শালগ্রামের শোওয়া-বসার মত হয়তো অতি সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু সহজে চোখে তাহা পড়ে না! তাহার উপরে টাকার দর যেভাবে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার খুব বেশি ইতরবিশেষ হয় নাই। উপরন্তু লোকে মনে করে, যাহারা গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বা ধর্মঘট করে, তাহাদের প্রতি গভর্নমেণ্টের ব্যবহারে ব্রিটিশ আমল হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই! এক বিষয়ে কিন্তু তফাত জনসাধারণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। ব্রিটিশ কর্তারা চুরিই করুক, চামারিই করুক, তাহারা যতই শোষণ করুক না কেন, তাহাদের অন্ততঃ শাসন করিবার দক্ষতা ছিল। বর্তমান শাসকদের শাসনেরও ক্ষমতা নাই, শোষণের পরিবর্তে প্রজাকে পোষণ করিবার ক্ষমতাও নাই। এ ক্ষেত্রে কি যে করা যায়, সাধারণ মানুষ সহজে পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অথচ তাহারা যে সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের শক্তিকেও ভাঙ্গিয়া দিতে চায় এবং সেই জায়গায় অপর কাহাকেও বসাইতে চায়, তাহাও নয়। পুরানো কংগ্রেস-কর্মীদের প্রতি তাহাদের ভালবাসা যে শূন্য হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু প্রাচীন কংগ্রেস-কর্মীরা পরস্পরের মধ্যে যেভাবে ক্ষমতার জন্য খেয়োখেয়ি করিতেছেন, ইহা দেখিলে তাহাদের ভাল লাগে না। যাহাকেই গদিতে বসান যায়, তিনি দেখিতে দেখিতে তপস্বী সাধু হইতে মোহান্তে পরিণত হন। উপরন্তু নেতাদের

---

* শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৫৬ / জুন ১৯৪৯ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বাদ দিয়া জনসাধারণ নিজে অগ্রসর হইয়া কিছু করিয়া বসিবে, ইহার মত উৎসাহও তাহাদের নাই, পথও কিছু জানা নাই।

শুধু আমাদের দেশের জনসাধারণের নয়, বিশ্বসংসারের সকল দেশেই সাধারণ মানুষের ইহাই হইল সাধারণ অবস্থা। তাহারা সর্বত্র শান্তিতে খাইয়া পরিয়া দিন কাটাইতে চায়; নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবার বা পাড়াপড়শী, বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া সুখে দুঃখে একটু স্বস্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। রাষ্ট্র বা সমাজকে দমকা বদলানোর গুরু দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চায়। অথচ যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের বা সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও গুরুতর বিষ জমিয়া উঠে, সেই বিষ সারা দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের স্বস্তির আশাকে আকাশ-কুসুমে পরিণত করে।

ইতিমধ্যে সমাজের এক দল চিন্তাশীল ব্যক্তি এই স্তিমিত অসন্তোষকে ঝিমাইয়া পড়িতে দেন না। তাঁহারা ফোড়ার উপরে গরম সেক দিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি ফাটাইবার ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ যে অসন্তোষ জড়তার চাপে ফাটিবার মত অবস্থায় পৌঁছিতেছে না, তাঁহারা তাতাইয়া তাতাইয়া সেই অসন্তোষকে ফাটাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। যে তামসিকতা বা জড়ধর্মের বশে মানুষ ঝিমাইয়া পড়ে, অনেক দুঃখ এবং শোষণকে বরদাস্ত করে, তাঁহারা কড়া পুলটিস দিয়া সেই মানুষকে জাগাইয়া সমাজের ফোড়া ফাটাইবার চেষ্টা করেন। সেই সন্ধিক্ষণে সমাজ-পরিচালনার হাল তাঁহারা নিজেদের হাতে ধরেন, জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেন। এই নূতন মাঝির হাতে দেশের হাল ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণ আবার নূতন বিশ্বাসে এক দান ঝিমাইয়া লয়।

ইতিমধ্যে নূতন শাসকের দল সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁহারা ব্যক্তি-হিসাবে কাজ না করিয়া দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল বা পার্টি হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। স্বীয় পার্টির মধ্যে কোন সভ্য যদি জনসাধারণের সর্ববিধ মুক্তির পরিপন্থী কিছু করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, তখনই তাঁহাকে নির্মম হস্তে অপসারিত করা হয়। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে কোনও আদর্শচ্যুতি না ঘটে, সে বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন; এবং জনসাধারণের সম্পর্কে অন্ততঃ এইটুকু লক্ষ্য রাখেন, যেন তাহারা স্বীয় জড়ত্বে পুনরায় মগ্ন হইয়া গেলেও পার্টির প্রতি বিশ্বাস না হারায়। আর যাহাতে জড়ত্বে একেবারে

ডুবিয়া না যায়, সে জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের জীবন বা অস্তিত্বকে বিপন্ন না করিয়া উইদরিং অ্যাওয়ে অফ দি স্টেট (withering away of the state) সম্পর্কে যথাসম্ভব আয়োজন করেন।

জনসাধারণের সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। জনসাধারণ যে জগন্নাথের রথের মত গতিতে চলে, অর্থাৎ অনেকক্ষণ এক জায়গায় আটকাইয়া থাকিবার পর হেঁচকা টানে হঠাৎ একবার নড়িয়া ওঠে, দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলে, হয়ত বা বক্রপথও লয়, তাহার পর আবার আচম্বিতে থামিয়া যায়, এ কথা তাঁহারা ভাল ভাবেই জানেন। এবং জনসাধারণের চরিত্রকে বদলাইবার চেষ্টা না করিয়া, বর্তমান স্বভাবের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহারা জগৎকে পরিবর্তন করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, শোষণ-বিহীন সমাজ রচনা করার শক্তি আয়ত্ত হইলে তাঁহারা যে সকল নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, সে নূতন সমাজগঠনের ছায়াতলে সাধারণ মানুষের চরিত্রও পরিবর্তিত হইয়া আসিবে। বাস্তববাদী হিসাবে তাঁহারা মনে করেন, বস্তু আগে, মন পরে। আজ মানুষের চরিত্রে যে জড়তা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে জড়তাকে দুষ্ট ঘোড়ার মত বিপ্লবের রথে জুড়িয়া তাঁহারা আজ কার্যসিদ্ধি করিতে চান, তাহাও চিরস্থায়ী নয়। Withernig away of the State-এর কাজ সম্পূর্ণ হইলে এই মানুষই জগন্নাথের রথের মত গতিতে না চলিয়া চাকায় বল-বেয়ারিংযুক্ত মোটর-কারের মত অতি সহজ সরল গতিতে চলিবে। কিন্তু সে অবস্থা আনিবার জন্য আজ মানুষের চরিত্রে যে-শক্তি যে-দুর্বলতা আছে, তাহার সবটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া উপায়ের চিন্তা করিতে হইবে। রাষ্ট্র খারাপ, হিংসা খারাপ, তবু ভবিষ্যৎকে গড়িবার জন্য এই হিংসাকে, এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করিতে হইবে। যাহারা সে কাজ না করিয়া মানুষের চরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ কল্পিত চরিত্রের সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া সমাজ-বিপ্লবের উপায় উদ্ভাবন করে, তাহারা আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও কার্যত তাহারা বর্তমান শোষণ-ব্যবস্থার আয়ু দীর্ঘ করিয়া দেয়, কেন না বিপ্লবকে পিছাইয়া দিবার জন্য তাহারাই বেশী দায়ী। কমিউনিস্টপার্টির সভ্যগণ মনে করেন, আজ ভারতবর্ষে গান্ধীবাদীগণ ইতিহাসের পটে সেই ভূমিকাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; রুশদেশে নারড্‌নিকের কার্যও তাহাই ছিল। বাকুনিন, ক্রোপট্‌কিন ঐ পথের পথিক ছিলেন; তাঁহারা

মনে আকাশচারী ছিলেন, কার্যতঃ প্রতিবিপ্লবী ছিলেন। অতএব তাঁহাদের নির্মম হস্তে সংসার করা উচিত।

এতক্ষণ ধরিয়া কমিউনিস্ট পক্ষের কথা বলিলাম। তাঁহারা কি দৃষ্টি লইয়া জনসাধারণকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ লেনিনের 'দি স্টেট অ্যাণ্ড রেভোলিউশন' নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১ "হিংসাত্মক বিপ্লব ভিন্ন রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধনিকশ্রেণীর হাত হইতে ছিনাইয়া সর্বহারাদের অধিকারে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু সর্বহারাদের রাষ্ট্রকে দূর করিতে হইলে, অর্থাৎ সমাজকে রাষ্ট্রের মারফত পরিচালিত করার পর্ব সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইলে, (হিংসাত্মক বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমশ রাষ্ট্রের কাজ বে-সরকারী, লোকায়ত্ত বহু প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা এবং সমাজপরিচালনার অভ্যাসের বিস্তারের দ্বারা—কার্যতঃ অহিংস উপায়ে,) উইদরিং অ্যাওয়ে অফ দি স্টেটের দ্বারাই তাহা কেবল সম্ভব হয়। (১ম অধ্যায়)।

২ "আমরা স্বপ্নবিলাসী নই; কি করিয়া এখনই সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ মুছিয়া দেওয়া যায়, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটান যায়, আমরা তাহার "স্বপ্নে" বিভোর হইয়া থাকিতে চাই না। যাহারা নৈরাজ্যবাদী তাহারা এরূপ স্বপ্ন দেখে, সর্বহারাদের পক্ষ হইতে যে ডিরেক্টরশিপ প্রতিষ্ঠিত হইলে (তবে বিপ্লব সম্ভব) তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে (স্বপ্নবিলাসীরা) কিছু বোঝে না। ঐরূপ মত মার্ক্সীয় মতবাদের মূলমন্ত্রের বিরোধী; যাহারা মানুষের মন পরিবর্তিত হইলে তবে বিপ্লব হইবে মনে করে তাহারা কার্যতঃ সমাজতন্ত্রসম্মত বিপ্লবের আবাহনে বিলম্ব ঘটায়।

তাহার পরিবর্তে আমরা মানুষের মনের বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইতে চাই। মানুষের স্বভাবই এমন যে তাহা বাধ্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং ছোট বড় পরিচালককে বাদ দিয়া চলিতে পারে না।"

1. The substitution of proletarion for capitalist state is impossible without a violent revolution, while abolition of the proletarion state, that is, of all states, is only possible through "withering away." (Ch. I.)

2. We are not utopians, we do not indulge in "dreams'

of how best to do away *immediately* with all management, with all subordination ; these are anarchist dreams based upon a want of understanding of the task of a proletarian dictatorship. They are foreign in their essence to Marxism, and, as a matter of fact, they serve but to put off the Socialist revolution "until human nature is different." No, we want the Socialist revolution with human nature as it is now ; human nature itself cannot do without subordination, without control, without managers and clerks. (Ch. III)

৩। "কিন্তু 'কারখানা'-সুলভ এই নিয়মানুবর্তিতা কখনও আমাদের আদর্শ নয়, ইহা আমাদের শেষ লক্ষ্য হইতে বহু নিম্নে। ধনতন্ত্রের পরাজয়ের পর, শোষকশ্রেণীর পতনের পর সর্বহারাদের উপরে এই (কঠোর) নিয়মানুবর্তিতা কেবল (সাময়িকভাবে) প্রবর্তিত হইবে। এই ধাপে পা রাখিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইব, ধনতান্ত্রিকগণ যে বর্বরতা এবং ঘৃণিত উপায়ে শোষণ-প্রক্রিয়া চালাইতেছে তাহা নিশ্চিহ্ন করিবার জন্যই ইহা (সাময়িকভাবে) প্রয়োজন। আমরা আরও অগ্রসর হইতে পারিলে ইহার প্রয়োজনও মিটিয়া যাইবে। যখন সকলে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসারে উৎপাদনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, এবং কার্যতঃ উহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে·· যখন সমাজজীবনের নিয়মগুলি শাসনের অধীন না থাকিয়া দণ্ডের ভয় বাদ দিয়া মানিয়া চলিবার অভ্যাস সকলের মধ্যে দেখা দিবে, তখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে প্রথম পৈঠা ছাড়িয়া আমরা দ্বিতীয় পৈঠায় উঠিবার যোগ্যতা লাভ করিব তখন দণ্ডশক্তি সমাজদেহ হইতে মুছিয়া ফেলিবার উপযুক্ত সময় আসিবে।

"অভ্যাসের মূল্য যে কত বেশি তাহা বুঝাইবার জন্য এঙ্গেল্‌স বলিয়াছেন, নূতন মানুষ নূতন এক মুক্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠিলে সমাজে দণ্ডশক্তির আর প্রয়োজন থাকিবে না। (যাহার পা খোঁড়া সে লাঠি ধরিয়া চলে। কিন্তু খোঁড়া পা সারিয়া গেলে সে যেমন লাঠিখানা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিতে পারে, মানুষও তখন দণ্ডশক্তিকে অপ্রয়োজন বোধ করিয়া তাহা পিছনে ফেলিয়া আসিবে।)"

But this 'factory' discipline, which the proletariate will

extend to the whole of society on the defeat of capitalism and the overthrow of the exploiters, is by no means our ideal, and is far from our final aim. It is but a foothold as we press on to the radical cleansing of society from all the brutality and foulness of capitalist exploitation ; we leave it behind as we move on...When all have learnt to manage, and really do manage Socialised production...the door will then be wide open for a transition from the first phase of communist society to its second higher phase, and along with it to complete withering away of the State. (Ch. V)

People will *grow accustomed* to observing the elementary conditions of social existence *without force and without subjection.*

In order to emphasise this element of habit, Engels speaks of a new generation, brought up under new and free social conditions which will prove capable of throwing on the dust heap all the useless old rubbish of State organisation. (Ch. IV)

গান্ধীবাদ

এই পথেই রুশদেশ চলিয়াছে, এবং ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টিও এই পথেই চলিতেছেন। মানুষের বর্তমান স্বভাব যখন শাসন চায়, তখন তাহার সেই স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্তনের উপায় নির্ধারণ করা কমিউনিজীমের লক্ষ্য। কিন্তু গান্ধীজীর এইখানেই ছিল আপত্তি। যদি মানুষের মধ্যে জড়ত্বের ভাব আজ বেশি থাকে, তাহা হইলে সেই জড়ত্বকে দূব করিবার চেষ্টা তো এখন হইতেই করা উচিত। কমিউনিস্টগণ বিশ্বাস করেন, ধনিকশ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের অবশিষ্ট বিরোধিতাটুকু সমূলে দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রের সকল শক্তিকে প্রথমে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে; গান্ধীজীর ঠিক এইখানেই আপত্তি ছিল। শাসনদণ্ড বা হিংসাত্মক উপায়ে যে ভাল করা যায় সে ভালর স্থায়িত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কেন বিশ্বাস করিতেন না তাহার কারণ আজ পৃথিবীর ইতিহাসের পটে লিখিত আছে। সে বিচার উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে রাষ্ট্রের অধিকার বা ক্ষমতা কোনও পার্টি বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত

বা ঘনীভূত করিয়া দিলে পরে তাহার বিকেন্দ্রীকরণেই বাধা জন্মায়। এবং এইরূপ কেন্দ্রীভূত অবস্থা কত দিন পর্যন্ত যে চালাইবার দরকার হইবে তাহাও খড়ি পাতিয়া কেহ বলিতে পারে না। ফলে বিকেন্দ্রীকরণের আশায় যুগের পর যুগ কাটিয়া যায়, অথচ মানুষ কেন্দ্রীভূত শাসনের দ্বারাই শাসিত হইয়া চলে।

অতএব ইহা হইতে মুক্তির উপায় হইল বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারাই শক্তির কেন্দ্রীকরণকে পরাস্ত করা। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, আক্রোশের দ্বারা ক্রোধকে দমন করিতে হইবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতার বিনাশ সাধন করিতে হইবেঃ ইহাই সনাতন পথ। গান্ধীজীও সেই নীতির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক শক্তির উন্মেষের দ্বারা শক্তির কেন্দ্রীকরণকে পরাস্ত করিতে হইবে, উহা ভিন্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপর কোনও উপায় নাই। হিংসার প্রভাবে যে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দ্বারা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

ইহাই গান্ধীবাদের মূল কথা; এবং এইখানেই গান্ধীবাদের সহিত কমিউনিজ্‌ম বা মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক প্রভেদ।

ভারতবর্ষেই হউক আর পৃথিবীর অন্য কোন স্থানই হউক, সাধারণ মানুষ যদি মনে করে, "আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করিব, মাঝে মাঝে ভোট দিয়া বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিব; প্রতিনিধিরা যদি ঠিকমত কাজ না করে, যতদিন পারি সহ্য করিয়া, অবশেষে তাহা অসহ্য বোধ হইলে হঠাৎ জগন্নাথের রথের মত দমকা চালে চলিয়া রথচালকদের নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব, আবার নূতন রথচালক আসিবে, তাহাদের লাই দিয়া দেখিব, তাহারা কতদূর পারে; আবার যদি না পারে, তাহা হইলে পুনরায় বিদ্রোহ করিব"—তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। সে পথ কমিউনিজ্‌মের পথ, পছন্দ হইলে যে-কোন দেশ সেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের মতে ছোরাছুরি দিয়া রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারে। রোগের হাতে ভোগা অপেক্ষা ছুরি চালাইয়া চিকিৎসা যে ভাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু গান্ধীজীর পথ ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বলিতেন, রোগ যতই কঠিন হউক না কেন, প্রাকৃতিক উপায়ে তাহার চিকিৎসা করা সম্ভব। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও সকল রোগীকে ভাল করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসা-পদ্ধতিই এমন যে, রোগের মূল কারণ প্রতিকার অপেক্ষা তাঁহারা

রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য বেশী চেষ্টা করেন, উপসর্গের নিবৃত্তি হইলে রোগের নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু অনেক সময়ে ঔষধের জোরে এক রোগ চাপিতে গিয়া নূতন একটি রোগের উদয় হয়। হাঁপানি সারাইতে গিয়া রোগীর হয়ত চর্মরোগ দেখা দেয়। অতএব প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধানই ভাল।

যে মৌলিক কারণবশতঃ রোগের বিষ দেহে জমিতেছে, সদাজাগ্রতভাবে সেই বিষকে দূর করিতে হইবে। আমাদের বর্তমান সমাজে দেখা দেয় শোষণজনিত দুঃখ সংসারের অসংখ্য মানুষের জীবনকে জর্জরিত এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। প্রথম প্রশ্ন হইল, মনেপ্রাণে আমরা কি ইহার সমূলে প্রতিকার চাই? যদি চাই, তবে মনের জগৎ হইতেই পরিবর্তনের সূত্রপাত করিতে হইবে। নিজের ক্ষমতা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, নিজের জীবনে অ-শোষণের নীতি মানিয়া চলিব, জীবনের বহিরঙ্গে পরিবর্তনসাধন করিব। ব্যক্তির জীবনে যাহা সাধন করা যায় তাহাতে কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। তাহাকে সমাজজীবনে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। সেই ব্যপ্তির উপায় হইল সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের দ্বারা শোষণপূর্ণ সংসারের দুর্গপ্রাচীরে আমাদের বহু জনকে মিলিত হইয়া বহু দিক হইতে আঘাত করিতে থাকিব। সেই সংগ্রাম, সেই নিরলশ চেষ্টার দ্বারা সমাজের উৎপাদনব্যবস্থাকেও আমরা ঢালিয়া সাজাইব। এই বিপ্লব সমাজদেহের বহিরঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থাতেও বিপ্লব আনিবে। বুদ্ধদেবের ভাষায় "মনঃ পুব্বঙ্গমা ধম্মা"—মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, অগ্রণী। সেই শোষণদোষ দূর করিবার আদর্শে সমর্পিত মন জগতেও শোষণবিহীন প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া লইবে।

গান্ধীজীর মন-কেন্দ্রিক বিপ্লবের উপায় এবং কমিউনিজ্‌মের বস্তুকেন্দ্রিক বিপ্লবোপায়ের এইখানেই প্রভেদ। কমিউনিজ্‌ম সাময়িক প্রয়োজনে মানুষের উপস্থিত জড়ত্বকে স্বীকার করিয়া আশু লাভবান হইলেও গান্ধীজী আশুলাভ অপেক্ষা ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মানুষের পরিবর্তন ক্ষমতার উপরেই বেশী আশ্বাস রাখেন।

ইস্কুলের মাস্টার জানেন, ছাত্রকে দুই ঘা বেত মারিলে তাহার দ্বারা সত্ত্ব সেই কাজ পাওয়া যাইতে পারে। "কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা বেত মারিয়া ব্যক্তিকে সংশোধন করার পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। কারণ, শিক্ষকেরা জানেন,

উহার দ্বারা ছাত্রের ব্যক্তিত্ববিকাশের স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয়। বেত মারাকে আজ আমরা বর্বরতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবের বেলায়, অর্থাৎ বহুর বেলায়, আমরা আজও মনে করি, মানুষ যখন দণ্ড মানে, অর্থাৎ সোজা কথায় ঠ্যাঙ্গানিকে ভয় পায় তখন ঠ্যাঙ্গানির দ্বারাই দ্রুত কার্যসিদ্ধি করিয়া লওয়া যা'ক। যাহারা মানুষের (সমষ্টিবদ্ধ অবস্থায়) ভালত্বের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে তাহারা স্বপ্নচারী! কিন্তু সেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভালত্বের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করাকে বৈজ্ঞানিক পথ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গান্ধীজী সমষ্টিগত জীবনে মানুষের বর্বরতাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যক্তির জীবনে ফ্রোবেল, পেস্টালোজি, মণ্টেসরি, ফ্রয়েড প্রমুখ অনেকেই তাঁহার পূর্বে বা সমকালে ঐ চেষ্টায় অসম্ভব সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন।

জনগণ

জনগণের বিষয়ে যে কথা বলিতেছিলাম। তাঁহারা যদি মনে করে—"আমরা স্বীয় স্বভাব বদলাইব না," তবে তাঁহারা সমাজদেহে বিষ জমিয়া উঠিলে মারের চোটে ভূত ছাড়াইবার জন্য কমিউনিস্ট ওঝা ডাকুন, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যদি মানুষ মনে করে, ব্যক্তির জীবনে বহুকালের প্রচলিত শিক্ষকের বেত্রদণ্ড বর্জন করিয়া আমরা যেমন সভ্য হইয়াছি, সমষ্টির জীবনেও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়, তবে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। দুই বৎসর আগে পর্যন্ত তিনি আমাদিগকে হাতে-কলমে যে-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখিতে পারি। যদি সত্যাগ্রহের পথে না হয়, তখন না হয় হোমিওপ্যাথি ছাড়িয়া অ্যালোপ্যাথিরই ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু অ্যালোপ্যাথি ভিন্ন চিকিৎসার আর কোন পথ নাই, এরূপ অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করায় মানুষের অন্তরে যে জড়ত্ব জমিয়া আছে, যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া মানুষ সভ্যতার সৌধনিকেতন গড়িয়াছে, তাহারই অর্থাৎ সেই অন্ধ বিশ্বাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করা হয়।

তবু ইহার জন্য যতটুকু জড়ত্ব বর্জনের প্রথম হইতেই প্রয়োজন আছে, তাহা ভারতবর্ষের বহুদিনব্যাপী জড়ত্বের দ্বারা পীড়িত জনসমষ্টির মধ্যে আজ দ্রুত দেখা দিবে কি না জানি না। হয়ত ইউরোপের আরও শক্তিমান রজোধর্মাবলম্বী

জনসাধারণের পক্ষে গান্ধীজীর বীর্যমণ্ডিত সভ্যতর বিপ্লবের পন্থা আশ্রয় করা আরও সহজ হইবে।

১৯২৫ সালে গান্ধীজী খানিক বেদনার্ত হৃদয়ে সেইজন্য লিখিয়াছিলেন :

"ইউরোপের জনসাধারণকে যদি উপরোক্ত মত স্বীকার করানো যায়, তবে তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, (সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য) হিংসার পথ আশ্রয় করার কোন প্রয়োজন নাই, অহিংস উপায়ের দ্বারা সহজেই তাহারা স্বীয় কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারে। ইহা অসম্ভব নয় যে, ভারতবর্ষে আমি যে গতিকে স্বাভাবিক ও সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা জড়ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইতে বেশী সময় লাগিবে। হয়ত ইউরোপের সজীব জনসাধারণ আরও সহজে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে।"

If the masses of Europe can be persuaded to adopt the view I have suggested, it will be found that violence will be wholly unnecessary to attain the aim and they can easily come to their own by following the obvious corollaries of non-violence. It may even be that what seems to me so natural and feasible in India, may take longer to permeate the inert Indian masses than the active European masses.

—(*Young India*, 3-9-1925 কিংবা *Studies in Gandhism*. p. 64-5.)

কাজের কথা

এইবার কাজের কথায় আসা যাক। গভর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেসের সম্পর্কে আলোচনাকালে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইংরেজ আচম্বিতে আমাদের হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বিপদে ফেলিয়াছে। দেখা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্টের যন্ত্র চালাইবার দক্ষতা আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাই। জনসাধারণকে আর্থিক ও সামাজিক মুক্তি দিব আমরা বলিয়াছিলাম। কিন্তু হাতে ক্ষমতা পাইয়া সেই ক্ষমতাকে কি ভাবে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যন্ত্রই এমন জটিল যে, তাহার দ্বারা দ্রুত কার্যসাধন সম্ভব নয়। সেই জটিলতা আয়ত্ত করিতে গিয়া আমরা মিস্ত্রীর পর মিস্ত্রী হারাইতেছি। কাহারও হাত কাটা যাইতেছে; কেহ বা মিস্ত্রী হইয়াছি—এই আনন্দে গাড়ি চালাইতেছে বটে, কিন্তু কোন্ ধনতান্ত্রিক খানার দিকে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে না।

এ অবস্থায় জনসাধারণ কি করিবে? কমিউনিস্টগণ যখন হিংসাত্মক উপায়ে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছে, তখন তাহাদিগকে সমর্থন করিবে, না চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং বর্তমান কংগ্রেস-কর্মীগণের অপদার্থতার ভারে পীড়িত হইয়া থাকিবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, ইহার কিছুই দরকার নাই। প্রতিকারের উপায় আছে; কেবল আমাদিগকে বুদ্ধিপূর্বক সেই প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে, নিজেদের চলিতে হইবে অপরকে চলিবার কৌশল বলিয়া দিতে হইবে।

কেহ কেহ আজ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, ইহার চেয়ে ইংরেজের শাসন ছিল ভাল। কিন্তু আমরা তাহা বলি না। কেন না, বর্তমান শাসককুলকে সত্যাগ্রহের দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া জনসাধারণের স্বরাজ আনা যে সম্ভব—ইহা ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস না করিবার হেতু এখন পর্যন্ত পাই নাই। সেই উপায়ের বিষয়ে বর্ণনা করিব। রোগ সারিবেই, এমন কথা বলিব না; কিন্তু "পরীক্ষা প্রার্থনীয়" এইটুকু নিবেদন তো করিবই।

দুই একটি বাস্তব সমস্যা লইয়া আলোচনা করা যাক।

জেলা বরিশাল, সদর মহকুমার অন্তর্গত নমঃশূদ্রপ্রধান একটি গ্রাম। গ্রামের লোক ধর্মভীরু, প্রায় সকলেই চাষী; কেহ কেহ ইট তৈয়ারি বা নৌকার কারবারও করিয়া থাকে। দুই-চার জন অর্থশালী ভদ্রলোক ইতস্তত আছেন, তাঁহারা মূলধন যোগান এবং যথেষ্ট মুনাফা সংগ্রহ করেন। দেশের যাহা আইন, সে আইন অনুসারে তাঁহাদের কোন বাধা নাই, অতএব তাঁহাদের ধনের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং উত্তরোত্তর চাষীও জমি বেচিয়া শুধু মজুরশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। কি করিয়া ইহা হয়, তাহার আলোচনা করিয়া প্রতিকারের উপায় বলিব।

গভর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে আজ টাকার অভাব। গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা নাই, যাহার নিকট নৌকা-নির্মাণে দক্ষ কোনও নমঃশূদ্র কারিগর কাঠ কিনিবার টাকার কর্জ পায়। যে সময় নৌকা গড়ার মরসুম, সে সময়ে সে বেকার বসিয়া থাকে। হঠাৎ গ্রামের কোন ভদ্রলোক তাহার বাড়িতে আসিয়া বলেন, "রাখাল, তোমার দেখিতেছি বড় কষ্ট, এই তিন শত টাকা লও; সুদ দিতে হইবে না। যখন পার শোধ দিও।" ধর্মভীরু রাখাল কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া শালকাঠ খরিদ করিতে যায়, নৌকা গড়ে, টাকায় টাকা লাভ করে, এবং চার

মাস পরে কৃতজ্ঞহৃদয়ে মহাজনকে তিন শতের জায়গায় চার শত বা তাহারও বেশী টাকা ফেরত দিয়া বলে, "আপনি ছিলেন বলিয়া ছেলেদের মুখে অন্ন দিতে পারিলাম। উপকারের চিহ্নস্বরূপ উপরি টাকা কয়টি আপনি দয়া করিয়া রাখুন।"

শুধু রাখালের মত ধর্মভীরু ছুতার নয়, এমন অনেক চাষী এবং ইটের কারিগর আছে, যাহারা মহাজনদের সঞ্চিত মূলধনের দ্বারা এইভাবে উপকৃত হইতেছে। উৎসাহী সমাজতন্ত্রবাদী বলিবেন, এখনই সকল মূলধন ছিনাইয়া লইয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হউক, এবং গ্রামে গ্রামে পোস্ট আফিসের মত ব্যাঙ্ক খুলিয়া রাখালকে বা গুরুপদকে টাকা দিয়া কাজে নিয়োজিত করা হউক। মহাজন যেমন টাকা ভাড়া দিয়া মুনাফা সঞ্চয় করে, রাখাল এবং গুরুপদও তেমনই স্বীয় খাটুনির ক্ষমতা বা শিল্পদক্ষতাকে বেচিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত না লইতে পারে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। নৌকা এবং ইট, ধান এবং পাট সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি করিয়া উহাদিগকে পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য দিতে হইবে। যাহা কিছু মুনাফা তাহা রাষ্ট্রের বা সমাজের হইবে, এবং সেই মুনাফা যথোচিত ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্র রাখালের শিক্ষা, চিকিৎসা, তাহার পুত্রের লেখাপড়া, কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। রাখাল নিজের সঞ্চিত ধনের দ্বারা যাহা করিতে পারে না, সমগ্র দেশে সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার চেয়ে অনেক বেশী সুবিধা সে পাইবে।"

কিন্তু প্রশ্ন হইল, সেরূপ রাষ্ট্র গঠন করিব কেমন করিয়া? কমিউনিস্ট বলিবেন, বিপ্লবের দ্বারা। অতএব আজ রাখালের দুঃখ দূর করার চেয়ে তাহাকে বিপ্লবের জন্য তাতাইতে হইবে; যত দ্রুত বিপ্লব আনা যায় রাখালের বংশধরের দুঃখও তত দ্রুত মিটিয়া যাইবে।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ও-পথে বিপদ কোথায়। অতএব সমাজের আমূল পরিবর্তন রাখালের সাহায্যে অহিংসভাবে কি করিয়া আনা যায় তাহাই বলিতেছি।

মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী। বিপ্লবের মূলও মানুষের মনে। যে কর্মিটী মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছেন, তিনি রাখালের নিকট যাইবেন। রাখাল নৌকা গড়ে, গুরুপদ ইট কাটে, দুই জনেই চাষের সময়ে চাষ করে। তাহা ছাড়া গ্রামে আরও পঞ্চাশ জন লোক আছে, যাহাদের হাতে দুই-চারিটি করিয়া টাকা আছে। কর্মী তাহাদের কাছে যাইবেন। প্রত্যেকের কাছে অনেক

বুঝাইতে হইবে ; বকিয়া বকিয়া হয়রান করিতে হইবে। কিন্তু সকলকে এই কথা বুঝাইতে হইবে যে, সমবেত টাকা লইয়া আমরা সমবায় সমিতি খুলিব। তাহার শক্তিতে প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করিবার সুযোগ পাইবে, নিজের মজুরিও পাইবে। কিন্তু মুনাফা একা কাহারও হইবে না, সমস্ত মুনাফা সমিতির হইবে। সেই সংগৃহীত টাকার দ্বারা সবাইকার জীবন আরও ভালভাবে চলিবে। কর্মী তাহাদের হাতে-কলমে কাজ করিয়া দেখাইবেন, ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবায়সম্মত উপায়ের দ্বারা মানুষ আরও ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু কথা হইল, এইরূপ সংস্কারমূলক চেষ্টার দ্বারা এই ধনতন্ত্রশাসিত বিশাল জগতে কতটুকুই বা মানুষ করিতে পারে? জগতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভারতবর্ষের মধ্যেই বা গভর্ণমেণ্টের জড়তার কারণে, কংগ্রেসকর্মীদের আদর্শচ্যুতির জন্য এরূপ ক্ষুদ্র সমবায়চেষ্টা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে?

আর একটি দৃষ্টান্ত লইয়া, এরূপ প্রচেষ্টার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কত দূর তাহা চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ধরুন, বীরভূম জেলা। সেখানে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন। আগে দেশে বেশী শিক্ষিত লোকের ঠাঁই ছিল না। অল্প কয়েকটি স্কুল হইলেই চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ আর তাহাতে কুলায় না। পরে ধনী দুই-চারজন ভাল লোক গ্রামে স্কুল করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতেন। কিন্তু আজ একা বীরভূম জেলাতে যত অল্পবয়স্ক ছাত্র আছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের আইন বা সাহায্য ব্যতিরেকে তত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গান্ধীজী ১৯২৮ সাল হইতে এ-বিষয়ে চিন্তা করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা শিক্ষাও ভালমত দেওয়া যায়, অথচ চালু খরচের একাংশ ছেলেদের শিল্প হইতে উঠিয়া আসে।

ধরুন, গান্ধীবাদে বিশ্বাসী বৈপ্লবিক কর্মী ঠিক করলেন, আজ যখন স্বাধীনতালাভ হইয়াছে, আমরা গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করিব, অর্থাৎ বহু বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিব। হয়ত তিনি প্রথমে গভর্ণমেণ্ট-আপিসে হাঁটাহাঁটি করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষা-বিভাগেও বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য একটি শাখা আছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শাখা গান্ধীজীর প্রবর্তিত "বুনিয়াদী" নামটি গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার খোল-নলচে একেবারে বদলাইয়া দিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা ছেলেদের শিক্ষায় স্বাবলম্বনে বিশ্বাস

করেন না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা দেওয়া উচিত, এইরূপ মতই পোষণ করেন। কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহা জানেন না। উপরন্তু, বুনিয়াদী-শিক্ষকদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার পর, অনেক শিক্ষক তৈয়ারী করার পর, তাঁহারা দেখিতেছেন, সেই সকল শিক্ষককে নিযুক্ত করার জন্য স্কুল তৈয়ারী হয় নাই। এবিষয়ে কি করিবেন, তাহাও বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত সরকারী সমিতি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

অর্থাৎ বীরভূমের কর্মীটি স্বীয় জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলেন, গভর্ণমেণ্ট-আপিসে এমনই ব্যবস্থা যে বীরভূমে কার্যতঃ শিক্ষপ্রসার করা সম্ভব নয়। তখন তিনি বীরভূমের রাখাল, গুরুপদ এবং বড় বড় চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি বাড়ি গিয়া কিছু টাকা তুলিবার চেষ্টা করিবেন। একটি কেন্দ্রের জন্য খানিক টাকা তুলিয়া, তিনি উপযুক্ত জনমত গঠন করিয়া, গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবি করিবেন, "আমরা যতদূর পারি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি, এবার স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র আগাইয়া আসুক, রাষ্ট্রের সহায়তায় আমরা দেখি দেশের জীবনকে নূতনভাবে গড়া যায় কি না!"

রাষ্ট্রের কর্তারা শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু ধরুন, এমনই যদি হয় যে, এমন কোনও মহৎ ব্যক্তি শিক্ষাবিভাগে আছেন, যাঁহার ইস্কুল পাঠ্য টেক্সট্-বুক বীরভূম জেলায় খুব চলে, এবং বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার হইলে তাঁহার আয় কমিয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তিনি যদি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদানে ছলে-বলে-কৌশলে বাগড়া দেন, তবে বীরভূমের কর্মীটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইহার সর্ববিধ প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া যদি বিফল হন, নূতন দেশরচনায় স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের সহায়তা যদি সম্যক্ পরিমাণে লাভ না করেন, তবে তিনি গভর্ণমেণ্টের ক্ষুদ্র কর্মবিভাগের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিবেন। গভর্ণমেণ্ট যদি এডুকেশন সেস আদায় করেন এবং জনসাধারণের আগ্রহ ও সহযোগিতা উপেক্ষা করিয়া কোনও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা শ্রেণীর পরামর্শে বিপথগামী হ'ন, তবে সেই অবস্থার সংশোধন করিবার জন্য সত্যাগ্রহ অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে।

সত্যাগ্রহও সংগ্রাম, কমিউনিস্টদের বিপ্লবপন্থাও সংগ্রাম। কিন্তু সত্যাগ্রহের পথে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টকে সহযোগিতা দানের প্রস্তাবের দ্বারা কর্মী জনসাধারণকে যে-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ

করিয়া তোলেন, স্বীয় দাবির সম্বন্ধে সচেতন, এবং স্বীয় কর্তব্যের সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলেন, কমিউনিজ্‌মের পথে তাহা করা হয় না। কমিউনিজ্‌মে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা এমনভাবেই পার্টির শাসনাধীনে থাকে যে, প্রকৃত সত্যাগ্রহের মধ্যে জনসাধারণের যে স্ফুরণ সম্ভব তাহা কমিউনিজ্‌মের পথে কখনও হয় না। প্রথমে ভাঙ্গা, পরে গড়া—এক জিনিস, এবং গড়ার ভিতর দিয়া ভাঙ্গা—সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

এমন হইতে পারে, কর্মীগণ বর্তমান গভর্ণমেণ্টের নিকট বা কংগ্রেসী শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট সত্যাগ্রহের দ্বারা খানিক শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা, দুইটা খাল বা পথ তৈয়ারির সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী বন্ধু বলিতে পারেন, "যেখানে প্রকৃত শ্রেণীস্বার্থে আঘাত লাগিবে, সেখানে আপনারা সত্যাগ্রহের দ্বারা কিছুই আদায় করিতে পারিবেন না। তখন লেনিন-প্রদর্শিত হিংসাত্মক বিপ্লব ছাড়া গতি নাই।"

হইতে পারে, রোগীর পা ঘায়ে এমন পচিয়া গিয়াছে যে অ্যাম্‌পুটেশন ভিন্ন গতি নাই। কিন্তু গতি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী প্রস্তাব করিয়াছিলেন, চাষে মালিকের পাওনা অর্ধেক হইতে কমাইয়া তিন ভাগের এক ভাগ করিতে হইবে। গান্ধীজী তেভাগার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও ভারত স্বাধীন হয় নাই। তিনি অহিংস পন্থায় এই পরিবর্তন আনিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গলা দেশের গভর্ণমেণ্ট যখন নীতির দৃষ্টিতে তেভাগা সমর্থন করিয়াছেন, তখন কর্মীগণ মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে ওই নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য দাবি করিতে পারেন। যে কর্মী কোনও জেলায় এরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে নানা স্বার্থের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে সত্যাগ্রহেরও প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সত্যাগ্রহের পূর্বে তিনি কোনও বিশেষ গ্রাম-অঞ্চলে জনমত সৃষ্টি করিয়া দাবি জানাইবেন যে, "এখানকার অধিকাংশ লোক প্রস্তুত, এখন জেলা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবেও অন্তত এক জায়গায় দেখুন, ইহার ফলাফল কি হয় এবং এক্ষেত্রে কর্মীগণ সর্বান্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" তখন, এমন হইতে পারে, আইন-সভায় গভর্ণমেণ্ট পার্টিরই সমধিক লোক ইহার বিরুদ্ধতা করিবেন, কিন্তু যদি মন্ত্রীগণের মধ্যে

বৈপ্লবিক বুদ্ধি এবং সাহসসম্পন্ন কিছু লোকও থাকেন, তাঁহারা ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত কর্মীর সহযোগিতার আশায় পরীক্ষামূলক ভাবে তো অগ্রসর হইতেও পারেন। আর যদি ঘরের লোকেই বাদ সাধে, তবে গান্ধীবাদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সাহসী হইতে হইবে এবং আইন-সভার প্রতি-বিপ্লবী সভ্যগণকে বলিতে হইবে, "কমিউনিস্ট পার্টির মত আমরা কাহাকেও মারিতে চাই না, আপনি অমুক জেলায় জাগ্রত জনমতের সামনে দাঁড়াইয়া বলুন তো, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক বিপ্লব আপনি ঘটিতে দিবেন না।"

যদি মন্ত্রিসভায় একজনেরও বৈপ্লবিক আদর্শবাদ অবশিষ্ট না থাকে, তখন সর্ববিধ নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার অন্তে গান্ধীজীর বিপ্লবে বিশ্বাসী কংগ্রেস-কর্মীটি সত্যাগ্রহের আয়োজন করিবেন ; তাহাতে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আজ সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে, যখন গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলি জনসাধারণের সহযোগিতায় বৈপ্লবিক কর্মীগণ সত্যাগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। যাহাদের দৃষ্টি সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, যাহারা ধনী, যাহারা স্বার্থান্বেষী, তাহারা সত্যাগ্রহের নিকট নতিস্বীকার করিতে বাধ্য। গান্ধীজী সমাজ ও আর্থিক জীবনে যে বিপ্লবের কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ কংগ্রেস এবং গভর্ণমেণ্ট মারফত পূরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

লুই ফিসারকে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন,"আমাদের ধনীরা বিপ্লবে সহযোগিতা করিবে।" ফিসার বলিয়াছিলেন, "ধনীরা তো কোথাও সেরূপ সহযোগিতা করে না।" তখন গান্ধীজী তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাহারা বাধা না দিয়া পলায়ন করিয়া সহযোগিতা করিবে!"

They might co-operate by fleeing—(*A Week with Gandhi, p.91*)

'কিন্তু তামাশা নয়, সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হইল, আজ যে আমার বিরুদ্ধে রহিয়াছে তাহাকে সত্যাগ্রহের দ্বারা আমার সপক্ষে, নূতন সমাজব্যবস্থা-রচনায় সহযোগীর আকারে পরিণত করিতে হইবে।

আজ দেশের সম্মুখে সত্যাগ্রহের দ্বারা সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া, শান্ত নম্র অথচ দৃঢ়চিত্তে গান্ধীজীর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে। সে চেষ্টার দ্বারা কংগ্রেস এবং গভর্ণমেণ্ট নবজন্ম লাভ করিবে, নূতন রূপে রূপবান হইয়া উঠিবে।

গণতন্ত্রের সংকট*

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী এবং আরও চারজন বিশিষ্ট সমাজসেবীর নামে একটি বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। বিবৃতির মর্ম হইল, বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উত্তেজনার বশে হিন্দু জনতা যে-স্তরে নামিতে পারে তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সকল অহঙ্কার ধূলায় মিশিয়া যায়। পাকিস্তানের মুসলমান জনতা আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর, এরূপ বলার মত অভিমান আর আমাদের অবশিষ্ট নাই। আমরা দুই জনেই বর্বরতার শেষ সীমায় নামিয়া আসিতে পারি। উভয়েই যদি সমান অপরাধী হই, তবে ভারতবাসীর পক্ষে মিথ্যা আত্মশ্লাঘা পোষণ করিয়া লাভ কি? বিগত জানুয়ারি মাসে ঢাকা নারায়ণগঞ্জে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যতজন মুসলমান যুবক পূর্বপাকিস্তানে আত্মবলি দিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার অনুরূপ কিছুই ঘটে নাই। অতএব বিবৃতিকারিগণ বলিতেছেন, আমাদিগকে অবনত মস্তকে মনের মধ্য হইতে পাকিস্তানীদের প্রতি বিদ্বেষভাব দূর করিতে হইবে, দুই দেশের মধ্যে যাহাতে শান্তি ও সৌহার্দ স্থাপিত হয় তাহার জন্য একান্ত নম্র হৃদয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের কয়েকজন চিন্তানায়কের নিকট হইতে এরূপ একটি বিবৃতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং উপরোক্ত উপদেশের জন্য ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে মৌলিক রাজনৈতিক বিরোধের ফলে বারংবার উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইতেছে তাহার প্রতিকারের বিষয়ে যে নেতৃবৃন্দ কোন উল্লেখ করেন নাই, তাহার জন্য আপত্তির কোন কারণ নাই; কেন না উক্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তাঁহারা উপস্থিত করিতেছেন না। উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ নিজেকে বিবেকবিহীন পশুর মত যে-স্তরে অবনত করিয়া ফেলে সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করাই তাঁহাদের লক্ষ্য, আমাদের সুপ্ত বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মানবতা সংরক্ষণের জন্য তাঁহারা জনসাধারণকে যে-ভাবে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

* আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মে, ১৯৬৪ হইতে পুর্নমুদ্রিত।

আমাদের একটি বিষয় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিবাদের ফলে যখন মানবতার নিম্নস্তরে নামিয়া আসে তখন তাহা শুধু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বা বিদ্বেষেরই লক্ষণ নহে। যে-কোনও যুদ্ধে একপক্ষ যখন অপরপক্ষকে সংহার করিবার চেষ্টা করে তখন তাহারা ক্ষত্রিয়-জনোচিত বিবেকবুদ্ধির দ্বারা সর্বদা শাসিত নাও হইতে পারে। বার্লিন বা লণ্ডনের উপরে যখন বোমাবর্ষণ ঘটে, জাপানের উপরে যে ভাবে আগ্নেয় বাণ অথবা সর্বশেষে অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেও মানবিকতার ধর্ম সমানভাবে অবমানিত হয়। সভ্যতা বিস্তারের অজুহাতে ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা বা চীনে যে অমানুষিকতার পরিচয় দিয়াছে, রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টাণ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহা হিন্দু-মুসলমানের বর্বরতা অপেক্ষা লঘু নহে। উভয় বর্বরতার জন্য সমগ্র মানবজাতির মস্তক লজ্জায় অবনত হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই জগতে শান্তিকামীগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্য কোন শুদ্ধতর উপায়ে মানুষে-মানুষে সংঘাতকে পরিচালিত করা যায় কি না, যাহার দ্বারা স্বার্থের দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে, অথচ মানবতার সংকটও না ঘটে।

অতএব, মানবতার দিক দিয়া নয়, অন্য দিক হইতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিচার করা যাক্। প্রথমেই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রচুর মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও কোনও যুদ্ধ ঘোষিত হয় নাই। কাশ্মীরের অধিকার সম্পর্কে এবং চীনা আক্রমণের সময়ে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের ফলে উভয় দেশের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ-কথা প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই মানসিক বিভেদ যত বৃদ্ধি পাইতেছে ততই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাত্রাও বর্ধিত হইতেছে। ইংলণ্ড এবং জার্মানির মত দেশে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষি যতই বৃদ্ধি পা'ক না কেন, দেশে যতক্ষণ শাসনযন্ত্র চালু আছে ততক্ষণ সাধারণ জনতার মধ্যে যদি কোনও ইংরেজ নাগরিক অকস্মাৎ মনে করে, কয়েকজন ইংলণ্ডবাসী জার্মানকে পীড়ন করিতে হইবে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের পুলিশ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া জনতার এইরূপ ব্যবহারকে কঠোর হস্তে দমন করিবে; জার্মানদের সম্পর্কে যদি কিছু করিতেই হয়, গভর্নমেণ্ট করিবে, জনতার সে অধিকার নাই। ইহাই সভ্যদেশের নিয়ম, শক্তিশালী কর্মদক্ষ শাসনযন্ত্রের লক্ষণ। ইতিমধ্যে অবশ্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংলণ্ড-

জার্মানির রাজনৈতিক বিরোধের রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং দেশের জনসাধারণ নেতৃবৃন্দকে সমর্থন করিয়াই চলিবেন। অবশ্য চেম্বারলেনের আমলে ১৯৩৯ সালে যেমন ঘটিয়াছিল, নেতা যদি জনসাধারণের আস্থা হারান, তবে নিয়মতান্ত্রিক বা সংবিধানসম্মত উপায়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা গভর্নমেণ্টের করণীয় কার্য, অথবা পার্লামেণ্টে মীমাংসার যোগ্য সমস্যার দায়িত্ব স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া পথেঘাটে জার্মান সংহার করিয়া বেড়ায় না।

অথচ আমাদের দেশে এইটিই যেন বারম্বার ঘটিতে দেখা যায়। রাস্তায় কোনও মোটরচালক যদি কাহাকেও গাড়ি চাপা দেয় তাহা হইলে চালককে পুলিশের হাতে সমর্পণ না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনতা নিজেই বিচারের ভার লয় এবং অপরাধীর শাস্তিবিধান আরম্ভ করিয়া দেয়। এই তো কয়েক মাস পূর্বে বাজারে জিনিষপত্রের দাম যখন বাঙ্গলা দেশের গভর্নমেণ্ট কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিলেন না তখন কলিকাতা শহরে কয়েকটি বাজারে জনতা বিক্রেতাগণকে স্বীয় শাসনে আনিয়া দর কমাইবার চেষ্টা করিল।

এইরূপ ছোটখাট ঘটনা এবং বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে, ভারতের সাধারণ মানুষের মনে যেন গভর্নমেণ্টের উপরে আস্থা কতকাংশে কমিয়া আসিয়াছে। অবশ্য লোকসভায় বা আইনসভায় সভ্যগণের মধ্যে এই আস্থার অভাব নাই, তাঁহারা গভর্নমেণ্টকে শক্তিশালী ও কর্মপটু রাখিবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পথেঘাটে তো জনতা সর্বদা আত্মশাসনের বশে পরিচালিত হয় না, তাহারা আংশিকভাবে শাসনযন্ত্রের উপরে আস্থা হারাইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামার মারফৎ সমস্যা সমাধানের অন্ধ প্রয়াস করিতেছে, এই কথা বলাই আমার অভিপ্রায়।

আর এই অর্ধসুপ্ত অন্ধ অবস্থায় যোগান দিতেছে নানা রাজনৈতিক দল বা প্রচার। কেহ হয়ত ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য জমি তৈয়ারি করিতেছেন, কাহারও বা উদ্দেশ্য এত মহৎ না হইয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এই উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, গভর্নমেণ্ট মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তুহারাদের সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর সমস্যা পর্যন্ত কোন সমস্যারই সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া জনতা নিজেই অগ্রণী হইয়া এই সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। জনতার আচরণকে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার ও প্রমাণ না ভাবিয়া

শাসনযন্ত্রের প্রতি ক্রমবর্ধমান অনাস্থার পরিচায়ক বলিয়া ভাবিলে বোধ হয় আমাদের বিচার আরও সঙ্গত হইবে।

মানুষ যে সত্য সত্যই নানাবিধ দুর্দশার প্রতিকার খুঁজিতেছে, শাসনযন্ত্রকে আরও দৃঢ় ও কর্মকুশলী দেখিতে চায়, ইহার একটি বিচিত্র প্রমাণ অপর ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বিগত জানুয়ারি মাসের (১৯৬৪) দাঙ্গার সময়ে পুলিশবাহিনী যখন দাঙ্গাকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিল না, তখন সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতায় শীঘ্রই দাঙ্গা প্রশমিত হইল। তখন সাধারণ মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সেনাবাহিনীর তথাকথিত আতিশয্যের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্তম্ভে অভিযোগ প্রকাশিত হইলেও সেনা বিভাগের প্রয়োগে সকলে না হইলেও অনেকে যেন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহার তলে তলে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সেনাবিভাগের কর্মতৎপরতা বা নিরপেক্ষতার বিষয়ে সকলের আস্থা আছে। কিন্তু ইহাকে অসামরিক শাসনযন্ত্র বা সিভিল গভর্নমেণ্টেব প্রতি অনাস্থার মূর্ত প্রকাশ বলিয়াও বিবেচনা করা যাইতে পারে। যখন অসামরিক গভর্নমেণ্ট কোনও কারণে সঙ্কটময় অবস্থা সামলাইতে না পারে, তখন জনগণের বিভিন্ন সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আগাইয়া আসিয়া গভর্নমেণ্টের কাজের সহায়তা করে। ইহা সকল উন্নত সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীজী ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালি বা কলিকাতার দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব কিছুতেই সামরিক বিভাগের হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিহারে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট ও বাঙ্গলায় মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্ট ১৯৩৫ সালের গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া সর্বতোভাবে উভয়কে উপদেশের দ্বারা, স্বীয় প্রচারকার্যেব সহযোগিতার দ্বারা, তিনি সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শান্তিস্থাপনার দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয়, জনসাধারণেরও বটে, এই বুদ্ধিতে তিনি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহায়তায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজে সহায়তা করিতে লাগিলেন। যদি সংকটকালে সেনাবিভাগের সহায়তা লওয়া অনিবার্য হইয়া ওঠে সেক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা প্রয়োজনবোধে সিভিল গভর্নমেণ্টের অধীনে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই তাঁহার নির্দেশ ছিল। কোনওক্রমে সামরিক শক্তির নিকট সিভিল গভর্নমেণ্টের আত্মসমর্পণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। জনসাধারণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের

সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করুক, ইহাকেই তিনি ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্টতম উপায় বলিয়া মনে করিতেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বস্ত্রসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা প্রভৃতি সমাধানের জন্য হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ বর্ণনির্বিশেষে সকল ব্যবধানকে তুচ্ছ করিয়া মানুষের প্রতিদিনের সমস্যা মিটাইবার জন্য সারা ভারত জুড়িয়া বহু গঠনকর্মের কেন্দ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আজ উলটা হাওয়া বহিতেছে। দাঙ্গা-নিরোধের জন্য শুধু সামরিক বাহিনীর সহায়তা লওয়া হইল না, আপাতদৃষ্টিতে কলিকাতার সিভিল গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের হাতে দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ইহাকেই গণতন্ত্রের বৃহত্তম সঙ্কট বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কাশ্মীরের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দারিদ্র্য এবং ধনবৈষম্যের সমস্যা, প্রত্যেকটিরই সমাধান ধীরে ধীরে করা সম্ভব, যদি গভর্নমেণ্টের প্রতি সাধারণের আস্থা এবং সহযোগিতা অটল থাকে। কিন্তু বাহিরে না হইলে যে ভিতরে অনাস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়, যখন জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া নিজের হাতে অপরাধীকে সাজা দিবার চেষ্টা করে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীকে দমন করিবার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে। বিপদ এখানেই বেশি। যত দ্রুত এই প্রচ্ছন্ন অনাস্থা বৃদ্ধি পাইবে অথবা পাইতে দেওয়া হইবে, ততই লোকে ভাবিবে, "এরকম গভর্নমেণ্টের চেয়ে সারা দেশে যদি সামরিক শাসন কায়েম হয় তাহা হইলে চোরাকারবারীরা শায়েস্তা হইবে, শাসন ভালভাবে চলিবে এবং আমরাও সুখে থাকিব"।

এই মনোভাবকেই গণতন্ত্রের পথে সর্বাপেক্ষা কঠিন বাধা বলিয়া মনে করিতে হইবে। গান্ধীজী ভারতবর্ষকে, ভারতের মানুষকে নিবিড়ভাবে চিনিতেন। হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁহার একটি প্রধান আপত্তি ছিল, এরূপ বিপ্লবের দ্বারা সমগ্র সমাজের শাসনভার একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর আয়ত্তে আসে। আর যদি সত্যাগ্রহের দ্বারা ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে তাহা হইলে জনসাধারণ প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়।

বর্তমান সংকটকালে যদি ভারতবাসীর মন উত্তরোত্তর সিভিল গভর্নমেণ্টের প্রতি আস্থা হারায়, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মত সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ-আশঙ্কা নিতান্ত কাল্পনিক নয়।

এবং ইহা অপেক্ষা ভারতের পক্ষে আর অধিক দুর্দিন কি হইতে পারে? কেননা, তখন জনগণের স্বরাজ স্বপ্নের মত অলীক বস্তুতে পর্যবসিত হইবে।

এই সম্ভাবনা হইতে নিষ্ক্রমণের জন্য সর্বতোভাবে গণতান্ত্রিক শাসনকে কর্মক্ষম ও সুদৃঢ় করিয়া তোলা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য। প্রত্যেকের পক্ষে সুচারুভাবে শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং তদুদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা সমস্যাকে সর্ববিধ অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রসম্মত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। এগুলি গভর্নমেণ্ট-নিরপেক্ষ না হইয়া গভর্নমেণ্টের সহযোগিতায় চলিবার চেষ্টা করিবে। আর যদি মনে হয়, গভর্নমেণ্ট যথেষ্ট দ্রুত পদক্ষেপে চলিতেছে না, তখন সেই গভর্নমেণ্টকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। আর যদি আমরা অন্ধভাবে সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ বা অনাস্থাকে প্রকুপিত হইতে দিই, তবে অদূর ভবিষ্যতে পরোক্ষভাবে সামরিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণের জন্য শৃঙ্খল রচনা করিব, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত বিপ্লব*

বিগত জানুয়ারি মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর জাতীয় সংহতির সমস্যা যে বাঙ্গালীর মনকে নূতন করিয়া আলোড়িত করিতেছে ইহা অতীব সুখের বিষয়। স্থানে স্থানে এই প্রশ্নের আলোচনা চলিতেছে; কাজী আবদুল ওদুদ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ চিন্তানায়কগণ এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করিতেছেন, এবং বহু শ্রোতা ও পাঠক শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি "কম্পাস" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে সেখানে ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন উদিত হইয়াছে তাহার সংবাদ পাঠে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্বে শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের এক অধিবেশনে বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান আজ বহুলাংশে পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশের পর্যায়ে অধঃপতিত হইয়াছে। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙ্গলা ভাষা সংরক্ষণের আন্দোলনে এবং অধুনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে নূতন সমাজচেতনা সূচিত হয়, তাহাকে সম্যক্‌ভাবে পুষ্ট করিতে পারিলে সেখানে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আশু ভবিষ্যতে সংগঠিত হইতে পারে এরূপ আশা সহজে পোষণ করা যায়। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সঙ্গতভাবে বলিয়া থাকেন যে, শত উত্তেজনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কারণ, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তৎসহ পূর্ব-পাকিস্তানে উদীয়মান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করাও তেমনই প্রয়োজন।

স্বদেশে গণতন্ত্র রক্ষা করা অথবা পূর্বপাকিস্তানে বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করা, আমাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ভাল কাজ সব সময়েই ভাল এবং সাময়িক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া আমরা যদি শুভ রাজনৈতিক আদর্শকে সংরক্ষণ করিতে পারি, তাহা সকলেই ভাল বলিয়া স্বীকার করিবেন। আমাদের আচরণের বশে কোন্ দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিরূপ প্রতিক্রিয়া

* কালান্তর, ২৩শে মে, ১৯৬৪ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ঘটিবে, ইহার বিবেচনা সর্বদা গৌণ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত; স্বীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকাই যে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, ইহা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কিন্তু আদর্শের বিচার বা আদর্শপ্রতিষ্ঠার কৌশল সম্পর্কে নহে। উল্লিখিত আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কেহ কেহ দেখিতেছেন, বা তাহার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া আশা করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু চিন্তার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

পূর্বপাকিস্তানে গণতন্ত্রের দাবি যে পশ্চিমপাকিস্তানের তুলনায় সমধিক শক্তিশালী, ইহা মানিতে বাধা নাই। পশ্চিমপাকিস্তানে বলোচ, আফ্রিদি প্রভৃতি উপজাতির মধ্যেও যে গণতন্ত্র বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা সকলে জ্ঞাত আছেন। এই অবস্থায় বিপ্লবের সুবিধার জন্য সমগ্র পশ্চিমপাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক স্বীকার করা, অথবা উভয় অঞ্চলের মধ্যে জাতি-ভাষা-সংস্কৃতিগত ব্যবধানকে স্ফীত করিয়া একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করাকে মনে মনে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

অবশ্য বিপ্লবসাধনের কৌশল হইল, যদি ঐতিহাসিক কারণবশে কোনও সমাজে জনতার মনে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সাময়িকভাবেও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয় তবে বিপ্লবপ্রয়াসী দল সেই সন্ধিক্ষণের সুযোগ লইয়া প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে শক্তি ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করেন। রুশ দেশে লেনিন যখন বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেন তখন গণনায় তাঁহার দলে খুব বেশী লোক ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে সৈনিকগণ রুশ রাজশক্তির আদর্শের অসারতা এমন ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল, এবং ব্যর্থ যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাহাদের মন এত আকুল হইয়াছিল যে সেই সন্ধিক্ষণের পরম গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লেনিনের পক্ষে তড়িৎবেগে সেনাবিভাগের এক শ্রেণীর সভ্যের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্বপাকিস্তানে প্রায় সেইরূপ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, অন্ততঃ আসিবার উপক্রম হইতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যেও আবার পশ্চিমবঙ্গে সরকারের অযোগ্যতার বিষয়ে জনমত এমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, বিপ্লবকামীগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন পূর্বপাকিস্তানে বিদ্রোহের সূচনা

হইলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গেও বিপ্লব সংসাধিত হইবে। এই মুহূর্তেই না হইলেও হাওয়া এমনভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে যে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক গগনে কোনও দুর্যোগ দেখা দিলে উভয় বঙ্গে বিপ্লবের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইবে। অন্ততঃ সেই সুবর্ণসুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইবার জন্য এখন হইতে মনের প্রস্তুতি এবং পার্টির সংগঠনেরও একান্ত প্রয়োজন আছে।

বিপ্লবের উপরি-উক্ত কর্মসূচীর সমালোচনা করিব না। কিন্তু সাধারণ নাগরিক হিসাবে অথবা রাজনৈতিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়াও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্গালী আজ বাঙ্গালী বলিয়াই পশ্চিমপাকিস্তানের নিকটে হেয় হইয়া আছে, এরূপ ভাবনার দ্বারা পরিপুষ্ট পূর্বপাকিস্তান একদিন হয়ত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে, উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে পশ্চিমপাকিস্তানের নাগপাশ হইতে অব্যাহতি পাইতেও পারে। যদি পূর্বপাকিস্তান আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়, বলোচ বা আফ্রিদি প্রভৃতি পাঠান উপজাতিবৃন্দ অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য চায়, তবে বর্তমান রাজশক্তির অধিকারীগণ কি পাকিস্তানের এই বহুধা খণ্ডনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতির সমর্থনে সুস্পষ্ট জনমত সৃষ্টি করিতে পারিবেন না?

মনে হইতেছে, অন্ততঃ কাশ্মীরের প্রসঙ্গ লইয়া পূর্ব এবং পশ্চিমপাকিস্তানে খুব মতবিরোধ নাই। ভারত যদি সঙ্কল্প করে যে অতি দ্রুত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের দ্বারা কাশ্মীর সহ সকল প্রান্তের সমস্যার নিরসন করিবে, তাহা হইলেই যে পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তানায়কগণ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ মনে করিবার কারণ এখন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদিও আজ পাকিস্তানের তুলনায় ভারতরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের আদর্শ অনেক বেশী পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবু কাশ্মীর সেই গণতন্ত্রের সুখভোগ না করিয়া যদি পাকিস্তানের সহযাত্রী হয় তবে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া পূর্ব বা পশ্চিমপাকিস্তানে কেহ ইহাতে আপত্তি করিবে বা মনে মনে সন্তুষ্ট হইবে না এমন মনে করার কোনও হেতু দেখিতে পাইতেছি না।

আমার বলার অভিপ্রায় হইল, পাকিস্তানের গণতন্ত্রের শক্তি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন চিন্তা এখন পর্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। জাতীয় সংহতির টান এখন পর্যন্ত বেশী এবং সে জাতীয়তা ইসলামের ভিত্তিভূমির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভারতকে উভয় পাকিস্তানেই "হিন্দু" রাষ্ট্র বলিয়া এখন পর্যন্ত

বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন এবং সেই জন্যই কাশ্মীর সম্পর্কে উভয়ের মনে চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোনও সাজ্যাতিক প্রভেদ নাই।

ভারতেও যে গণতন্ত্রের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমন দাবি করিতেছি না। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই যখন ভিত কমবেশী কাঁচা, যেখানে সংগঠনের কাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় নাই, সেখানে আকস্মিক উদ্ভূত কোনও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে যদি রাষ্ট্রশক্তির বর্তমান অধিকারীগণকে ধরাশায়ী করা যায় তাহা হইলেই বিপ্লব যে গণতন্ত্রের পথে অমোঘ গতিতে অগ্রসর হইবে ইহার পর্যাপ্ত হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না।

অবশ্য সত্যাগ্রহের নীতি ও কৌশলের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার সংস্কার থাকায় হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের চেষ্টায় গঠনকর্মের প্রয়োজনীয়তাকে আমি হয়ত অতিরঞ্জিত করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কার সমর্থনে বাঙ্গলা দেশের আধুনিক ইতিহাসের একটি নজির দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিব।

১৯৩৫ সালের সংস্কার অনুসারে যখন ভোট লওয়া হয় তখন বাঙ্গলা দেশে মুসলিম লীগ অতি অল্পসংখ্যক আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ লীগের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে চাষীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। ফজলুল হক্ সাহেবের গভর্নমেণ্ট চাষীর করভার এবং ঋণ মোচনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে কৃষকদের মধ্যে গণচেতনা জাগরিত করিবার চেষ্টাও করা হয়। হক্ সাহেব যে-ভাবে নবোদিত মধ্যবিত্ত মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে গণতন্ত্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে কৃষককুলকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য উত্তরোত্তর সংগঠিত করিতেছিলেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগও স্বীয় শক্তি বিস্তারের জন্য যেভাবে কুশল পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন তাহাও প্রশংসার অযোগ্য নয়। মুসলিম জাতি যে একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জাতি, তাহাদের সহিত ভারতের হিন্দুর সংস্কৃতির এমন কি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও স্বার্থগত মিল নাই, উভয়ের মধ্যে শুধু খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক, এই কথাটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর কল্যাণে এমনভাবে প্রচারিত হইল যে শুধু বাঙ্গলাদেশেই নহে, পাঞ্জাব, সিন্ধু এমন কি পাঠান অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশেও লীগের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশ্য ইহার পশ্চাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা এবং রাজকর্মচারীদের যথেষ্ট সমর্থন ছিল। কিন্তু শুধু সেই সমর্থনকেই হিন্দু-মুসলমানের তৎকালীন ক্রমবর্ধমান বিভেদের জন্য

দায়ী করা যায় না। কংগ্রেসের গঠনকর্মের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিয়া রচিত অর্থনৈতিক বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য ছিল। হিন্দু-মুসলমান, বিহারী-বাঙ্গালী, পার্বত্য ও সমতলভূমির অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সহিত বুদ্ধিযুক্তভাবে পরিচালিত গড়ার কাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙ্গার কাজে আমাদের যত উৎসাহ ছিল, গড়ার কাজে তাহা ছিল না।

এরূপ কাঁচা ভিতের উপরে গাঁথা রাজনৈতিক দলগুলি ঐ অবস্থাতেই মোটামুটি থাকিয়া গেল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন অকস্মাৎ ব্রিটিশের অধিকার হইতে রাজশক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল, তখন অন্ততঃ মুসলিম কৃষকশক্তি পত্রপাঠ কমিউনিস্ট পার্টির ছোট ডিঙ্গি হইতে নামিয়া খেয়া পারের জন্য ইংরেজের তৈয়ারি পাকিস্তান-মার্কা মুসলিম লীগের বিরাট ষ্টীমারকে আশ্রয় করিল। জনশক্তি সাময়িকভাবে গণতন্ত্রের অভিমুখে ধাবিত না হইয়া সংরক্ষণশীল অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকারে চলিয়া গেল। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রেও অনুভূত হইল। সেখানে শতাব্দীকাল ধরিয়া অ-মুসলমান জনসমূহের মধ্যে সমাজসংস্কার এবং রাজনৈতিক চেতনা কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অর্থাৎ আমরা পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। যে গান্ধীজী সারাজীবন সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হইয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রশক্তির আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইল।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ ঘটিবে, প্রতিক্রিয়া সর্বদা জয়ী হইবে, এরূপ বলা আদৌ আমার অভিপ্রায় নয়। আমার উদ্দেশ্য হইল এই কথা বলা যে, গঠনমূলক কাজের সহায়তায় যদি বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্যক্‌ভাবে করা না হয় তাহা হইলে বর্তমান সমাজদেহে যে-সকল ফাটল রহিয়াছে সেই সব ফাটলের পথে বিপ্লবের শক্তি বিপথগামী জলস্রোতের মত নিষ্ফলভাবে প্রবাহিত হইবে। এবং বর্তমানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের সম্প্রদায়গত ব্যবধানের মাত্রাকে আরও বর্ধিত করিয়া দিবে।

মুসলমান যদি ক্ষেত্রবিশেষে শোষিত হয়, এবং পার্শ্ববর্তী সমভাবে শোষিত জনগণ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শোষণবিহীন সমাজ রচনার প্রয়াস করা যায়, তবে মুসলমানে এবং অপর নিপীড়িত সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক

ব্যবধান যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। বর্তমান কালে আদিবাসী সমাজে শোষণ নিরাকরণের জন্য যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার ফলে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্ধিত হইয়া জাতীয় সংহতির পথে এক নূতন অন্তরায়ের সৃষ্টি হইতেছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

যদি বিপ্লবকামীগণ মনে করেন, আজ সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তিকে, অথবা বাঙ্গালীর মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শক্তিকে সাময়িক প্রয়োজনেও পৃথক্‌ভাবে পরিপোষণ করা আবশ্যক, তবে একটি আশঙ্কার কথা নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক জীবনের উপযোগী নানাবিধ গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বা শক্তি এতই দুর্বল যে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে প্রস্তাবিত বিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত হইলে শক্তি গণতন্ত্রের পথে না চলিয়া অন্যপথে যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত বিপ্লবের জন্য যদি বাঙ্গালীত্বের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তবে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের পরিবর্তে হয়ত দেখা যাইবে বিহারী-বাঙ্গালী, ওড়িয়া-বাঙ্গালী অথবা মারওয়াড়ী ভাটিয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে বর্ধিত বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের আকারে জনগণের সকল সংগ্রামশক্তির অনাবশ্যকভাবে অপচয় ঘটিতেছে। এবং সেই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বকে শাসনে আনিবার জন্য অনিবার্যভাবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি বিজয়লাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনাও সূচিত হইতেছে না। বরং বিগত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে, এবং উত্তরোত্তর কাশ্মীরসমস্যা সম্পর্কে ভারতের দোলায়মান ভাবের কারণে যে সাম্প্রদায়িকতার বোধ সর্বত্র মাথা তুলিতেছে, বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে সেই দিকে শক্তির ভার ঢলিয়া পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তাহার অর্থ ইহা নয় যে আমরা জনগণের প্রকৃত মুক্তি বা স্ব-রাজের জন্য কোন চেষ্টাই করিব না। উপরি-উক্ত সকল যুক্তি বিপ্লবের বিরুদ্ধে নয়, বরং সত্যাগ্রহের প্রস্তুতির সপক্ষে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। গান্ধীজী অহিংস বিপ্লবে আস্থাশীল ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বিপ্লবের ধরণ অথবা প্রস্তুতিও স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। সমাজে যথেষ্ট সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অহিংস সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি গঠনকর্মের অভাবে জনগণ সত্যাগ্রহ শক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়ত্ত করিতে না পারে তবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিলেও হয়ত এক শ্রেণীর শাসকবর্গের

পরিবর্তে অপর কোনও শ্রেণীর শাসকবর্গের অভ্যুদয় ঘটিবে। জনসাধারণের স্ব-রাজ যে দূরে ছিল সেই দূরেই থাকিয়া যাইবে।

১৯০৯ খ্রীঃ হিন্দ-স্বরাজ নামক গ্রন্থে তিনি এই সতর্কবাণী প্রথম অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। পঞ্চাশ বৎসরের বেশী অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই সাবধানবাণীর প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। অহিংস সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি-স্বরূপ গড়ার কাজে পরম আলস্য এবং অবহেলার কারণেই গণতন্ত্রের পরাজয় ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই কথা বলাই আমার প্রধান অভিপ্রায়।

আমরা যেমন কর্ম করি, তেমন ফল পাই। কর্মফল কেহই এড়াইতে পারে না। দেবতাগণেরও কর্মফলের বিধান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় নাই।

সরকার ও গড়ার কাজ*

সম্প্রতি কলিকাতার হাঙ্গামা মিটিয়া যাওয়ার পরে নাগরিকদের পক্ষে আত্মপ্রসাদে মগ্ন না হইয়া অন্তঃসন্ধানী হওয়ার প্রয়োজন। বর্তমান ঘটনাবলীর ফলে অন্ততঃ তিনটি বিষয় পরিষ্কার হইয়াছে—(১) অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে শহরের জীবনযাত্রাকে অচল করিয়া দিতে পারে। (২) যাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামার পক্ষে নহে তাহারা একত্রিত হইয়া শক্তিসংগ্রহ করিতে পারে না এবং বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণে অসহায় বোধ করে। ফলে শান্তির পরাজয় ঘটে। (৩) হতাশার বোধ চারিদিকে বর্তমান। তাহার উৎপত্তির কারণ যাহাই হউক না কেন, তৎসহ শাসনযন্ত্রের উপরে অবিশ্বাস মিশিয়া আবহাওয়াকে ধ্বংসাত্মক করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে।

এবার সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা যা'ক্।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকার ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, কম্পোষ্টের দ্বারা সার-উৎপাদন প্রভৃতির প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরে নিয়ন্ত্রণের অসুবিধার জন্যই বোধ হয় এই নীতি পরিত্যক্ত হয়। হয়ত বৃহৎ নদী-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার দিকে ঝোঁক দেওয়ায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সময়ে নানাবিধ অসুবিধা বড় করিয়া দেখা দিল। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষা ও সংগঠনের চেষ্টায় কিঞ্চিৎ বাধা বা বিলম্ব অনিবার্য। লোকশক্তি গড়িতে হইলে এরূপ অসুবিধার ভিতর দিয়াই দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার ব্যর্থতার আসল কারণ হইল, ভাল করিয়া বাছিয়া এবং সংগঠনের দিকে যথেষ্ট নজর না দিয়া বহু জায়গায় তাড়াতাড়িতে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল।

বরং যে সকল জায়গায় নির্ভরযোগ্য কর্মী বর্তমান সেই সকল স্থানেই প্রথমে

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সফল করা উচিত। যদি অসুবিধা দেখা দেয় তবে কাজের নিয়ম বা ধরন বদলাইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া উচিত। কাজের সুব্যবস্থা দু-চার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন সে কাজকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়ানো উচিত, তাহার পূর্বে নয়।

এজন্য কৃষি দপ্তরটি সকলের চেয়ে সুদক্ষ হাতে দেওয়া প্রয়োজন। কৃষি-মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য বিনা বাধায় গ্রহণ করা উচিত।

কৃষি ঋণের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুতর। কৃষককে ঋণ দিতে হইবে এবং সর্বচেষ্টার ফলেও যদি কিছু অপচয় ঘটে তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে না। বরং ঋণ দিবার জন্য যে-সকল সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিবে তাহাতে দক্ষ এবং উপযুক্ত শিক্ষক বা সংগঠকের নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। যেখানে এরূপ সংগঠক আছেন সেখানেই কার্যারম্ভ হওয়া উচিত। একসঙ্গে সর্বত্র চেষ্টা না করাই ভাল। সরকারের পক্ষে সুনির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়া পরে ধীরে ধীরে এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো উচিত।

সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিয়াছেন। এগুলিকেও জনসংগঠনের উপায়ে পরিণত করা যায়। গ্রামে বা শহরের প্রায় প্রত্যেক অংশেই কোন না কোন স্থানীয় নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী বা এমন কোনও না কোনও ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যাঁহাকে সততা বা কর্মকুশলতার জন্য সকলে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সেরূপ ব্যক্তির সাহায্যে বণ্টনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে কি না তাহা সরকার সন্ধান করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের সহযোগিতায় স্থানীয় সংগঠনের সাহায্যে বণ্টনের ব্যবস্থাও করিতে পারেন। এরূপ নেতার অধীনে কর্মীদের সংগঠিত করা যায়। তাঁহারা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। যাহাদের সকলের চেয়ে প্রয়োজন বেশী, আগে তাহাদের অভাব মিটাইয়া পরে অন্যের প্রতি নজর দিবেন।

এই সকল কর্মীকে স্থানীয় অধিবাসী বা স্থানীয় ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এক সময় মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেস সংগঠনের জন্য প্রতি লোকালয়ে ছোট ছোট আড্ডার মত কোষ বা সেল (cell) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা এক শক্তিশালী কর্মচেষ্টা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।

স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের অর্থনৈতিক বা শিক্ষাসংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধানই প্রশাসনিক উপায়ে খোঁজা হইতেছে। জাতিসংগঠনের সকল সমস্যাকে শাসনতান্ত্রিক সমস্যায় পরিণত করা হইতেছে। জনগণের সমর্থন অবশ্য প্রার্থনা করা হয় সত্য, কিন্তু তাহা সরকারী কাজের সমর্থনের জন্যই খোঁজা হয়—জনগণ স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলুক, এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। স্থানীয় বে-সরকারী উদ্যমকে জাগ্রত এবং পরিচালিত করা এখন আর কংগ্রেসের সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা হয় না। শাসনযন্ত্রের উপরে চরম নির্ভরশীলতা যে জাতির ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরশীলতার মূল, একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

যে-দেশে সমগ্র পৃথিবীর এক-সপ্তমাংশ লোকের বাস সেখানে কোনও সরকারের পক্ষেই শুধু প্রশাসনিক উপায়ে নিষ্ক্রিয় জনগণের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব, ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সরকারের নিকট যদি এরূপ অসম্ভব দাবি করা হয় এবং সে দাবি পূর্ণ না হয়, তখন হতাশা অথবা নেতিবাচক নিরপেক্ষতার উদ্ভব অনিবার্য। দেশ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইলে ধ্বংসাত্মক নিষ্ফল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সেই অসন্তোষ সহজেই আত্মপ্রকাশ করে।

এই দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই গড়ার কাজে মন দিয়া জনশক্তিকে সুসংবদ্ধ করিতে হইবে। আত্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের প্রজা যদি যথাসম্ভব স্বীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে তখনও রাষ্ট্রযন্ত্রও সুশাসনে চলিতে থাকে। তাহার যতটুকুই সাধ্যায়ত্ত সে ততটুকুই করিতে চেষ্টা করে এবং জনসংগঠনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া স্বীয় ক্ষমতাকে উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত করিয়া লয়।

নির্বাচন ভাবনা*

কয়েকদিন পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষে জনৈক সাংবাদিক অনুগ্রহ করিয়া নির্বাচন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলাদেশে একটি কথা উঠিয়াছে যে রাজনৈতিক দল বা পার্টির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বরং প্রার্থীদের ব্যক্তিগত চরিত্র বা গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া ভোট দেওয়া উচিত। এই মতকে সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ আজ আমাদের রাজনীতি অথবা গভর্নমেণ্ট পরিচালনার ব্যাপার পার্টির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। প্রতি পার্টির মধ্যে ভাল লোক আছেন, মন্দ লোক আছেন। অর্থাৎ কেহ পার্টির আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন, সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা ব্যক্তিগত কারণে পার্টির সহিত সংযুক্ত আছেন, আদর্শের স্পষ্টতা বা নিষ্ঠা তাঁহাদের আচরণে কম দেখা যায়।

ইহা সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই প্রযোজ্য। গভর্নমেণ্ট বা বিধানসভায় তাঁহারা যখন নির্বাচিত হইয়া আসেন তখন পার্টির নির্দেশই তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের বশে পার্টির মধ্যে কাজকর্মের বা বিচার-বিবেচনার সময়ে তাঁহারা হয়ত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু বাহিরের আচরণে তাঁহাদিগকে একযোটে চলিতে হয়। ব্যক্তিগত ভালমন্দের তারতম্য তখন আর ধরা পড়ে না।

এ অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া ভোট দেওয়া সমীচীন মনে হয় না। পার্টি নিজের সভ্যগণের মধ্যে কাহাকে বিধানসভায় স্থান দিবেন অথবা না দিবেন তাহা তাঁহাদের নিতান্ত ঘরোয়া পারিবারিক ব্যাপার। সাধারণ ভোটদাতার সে সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার নাই। তিনি কেবল পার্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভোট দিতে পারেন; নির্বাচন-প্রার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ তাঁহার বিবেচনা করা উচিত নয়। ভোটদাতা অবশ্য যদি পার্টিবিশেষের সদস্য হন তাহা হইলে অপরাপর সদস্যের ব্যক্তিগত নিষ্ঠা বা

কার্যকুশলতাব সম্পর্কে তাঁহার বিচার করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার সহিত সাধারণ নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নাই।

অতএব ব্যক্তিগতভাবে আমি পার্টির আদর্শ প্রভৃতিকেই বিচাব করিব, নির্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তিগণেব চরিত্রকে নহে।

রাজনৈতিক মতামত নানাবিধ হইতে পারে। সে-বিষয়ে ভোটদাতাদের কোনও নির্দেশ দেওয়া বৃথা। বিভিন্ন দল স্বীয় আদর্শ সম্পর্কে যে-সকল প্রচার করেন, তাহা শুনিযা তাহাদেব যুক্তি বা সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীনভাবে বিবেচনা করিয়া যিনি যে মত সমর্থনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন তিনি তাহার অধিকারী। কেহ হয়ত স্বতন্ত্রপার্টিকে সমর্থন করিবেন, কেহ কংগ্রেসকে, কেহবা সাম্যবাদী দলগুলিকে ভোট দিবেন। এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই গণতন্ত্রের প্রধান কর্তব্য।

কিন্তু শুধু আদর্শের বিচারই নয়। আরও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কোনও রাজনৈতিক দলের আদর্শের প্রতি হয়ত আমি ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল। কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নহে। প্রতি দল স্বীয় আদর্শকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে কিরূপ দক্ষতা দেখাইতেছেন তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা কবিতে হইবে।

অবশ্য এ বিষযে বিচাব করাব জন্য দুইটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এক পার্টির আদর্শ হয়ত ভাল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিপর্যয়ে তাহারা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে না। সহানুভূতির সহিত বিচার করিতে হইবে, পার্টি কেন অপারগ হইতেছে। তাহারা নিষ্ঠার সহিত, দৃঢ়তার সহিত সুকৌশলে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার সকল চেষ্টা করিয়াও যদি ষোল আনা সফল না হয় তবে প্রজাবৃন্দ তাহাদিগকে সানন্দে ক্ষমা করিবে এবং অসফলতার জন্য তাহাদের উপরে সকল দোষ চাপাইবে না।

কিন্তু যদি ধীরভাবে বিচারের ফলে মনে হয় যে পার্টির যোগ্যতা নাই, ব্যক্তিগত প্রভাবলাভের অন্ধপথে তাহারা চলিয়াছে, যে প্রশাসনিক যন্ত্রের সহায়তায় তাহারা নূতন ভারত গড়িতে চায় তাহার সংস্কার বা পরিচালনা করার দক্ষতা তাহাদের নাই, তাহা হইলে পার্টির আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও আমি সে পার্টিকে ভোট দিব না। অপর কোনও পার্টিকে দিব কি না, সে-কথা স্বতন্ত্র।

অবশ্য আজ কংগ্রেস প্রায় বিশ বৎসর গভর্নমেণ্টের কার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। অপরাপর পার্টি সে সুযোগ পায় নাই। তাহাদের মধ্যে কোন

৫

কোন দল ভবিষ্যৎ বিপ্লবের প্রস্তুতিতেই মগ্ন ছিল, সরকার পরিচালনার কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করিবার সুযোগই তাহারা পায় নাই। সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহিত তাহাদের তুলনা করা কি সমীচীন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে।

কিন্তু পার্টি কি শুধু ভাঙ্গার কাজই করে? প্রত্যেকরই তো গড়ার দায়িত্বও খানিক আছে। ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক সমস্যা, মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা প্রভৃতি নানাবিধ কাজ পার্টির অধিকারের বহির্ভূত নয়। সে-সকল ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতির সহিত অপরাপর পার্টির কর্মচেষ্টার যথেষ্ট তুলনা করা চলে। একটিমাত্র ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক যন্ত্র কংগ্রেসের অধিকারে রহিয়াছে। সেই যন্ত্র অপরাপর পার্টির আয়ত্তে আসিলে তাহারা ইহাকে আরও ভাল অথবা মন্দভাবে চালিত করিতে পারিত কিনা তাহা বিচারের সুযোগ আমাদের আজও হয় নাই। কিন্তু অপরাপর অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বিচার চলে। এবং সেই বিচারের দ্বারা আদর্শ এবং আদর্শপ্রতিষ্ঠায় যোগ্যতা নিধারণ করিয়া ভোটদাতাকে স্বীয় মত স্থির করিতে হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি গান্ধীজীর মতবাদ পোষণ করি। কংগ্রেস বা অপর কোনও দলই গণতন্ত্রের মৌলিক গান্ধীসম্মত আদর্শের দিকে দেশকে লইয়া যাইতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীজী বলিতেন, ২১ বৎসর বয়স্ক প্রতি ব্যক্তিরই যেমন ভোটের অধিকার থাকা উচিত, তেমনি উর্ধ্বতন একটি বয়সে সেই অধিকার আবার শেষ হইয়া যাওয়া উচিত। ইহার অর্থ হইল, একটি বয়সের পর মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক বানপ্রস্থ অবলম্বন করা উচিত। ইহা আমি অত্যন্ত সমীচীন উপদেশ বলিয়া মনে করি। সেই বয়স অতিক্রম করিলে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব পরিহার করা উচিত। দেশ বা সমাজ তাঁহার পরামর্শ বা অভিজ্ঞতার দ্বারাই লাভবান হইবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

নানাদিক বিবেচনা করিয়া আমি একবার মাত্র সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দান করিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া অপর কোনও নির্বাচনে আর যোগ দিতে পারি নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক মহোদয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গণতন্ত্রের সর্বোত্তম অধিকারস্বরূপ ভোটদানের ক্ষমতার আপনি এভাবে অপচয় করা কি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন? আমার উত্তর হইল, ভোটদানের অধিকার

যে অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তাহা স্বীকার করি। কিন্তু পাঁচ বৎসর অন্তর একবার ভোটের দ্বারা শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিলেই যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা মনে হয় না। আমরা সমাজজীবনে বহু ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। প্রত্যেক নাগরিক পল্লীর মধ্যে পূজা সমিতি, লাইব্রেরি, নানাবিধ ক্লাব, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, মিউনিসিপ্যাল আপিস, দোকান, সমবায় সমিতির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। যদি আমরা সে-সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতিদিনের জাগ্রত চেষ্টার দ্বারা গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত করিতে চেষ্টা করি তবেই দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজনৈতিক গগনও তাহার প্রভাবে পরিশুদ্ধ হইবে। আর যদি প্রতিদিনের জীবনে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হয়, তবে পাঁচ বৎসর অন্তর একবার ভোটের সময়ে চেষ্টা করিলেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। ভোট তারকেশ্বরের মাদুলি নয় যে তাহা ধারণ করিলেই সমাজের সর্বব্যাধি বিদূরিত হইবে, এবং আমরা সকল অকল্যাণ হইতে মুক্ত হইব।

সভাপতির মন্তব্য*

পূর্ববর্তী বক্তাগণ নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, তার কারণ এবং প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁদের মূল বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে তৎসহ নিজের কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা আমার অবশিষ্ট কর্তব্য।

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক সংস্কারপ্রচেষ্টা এবং জাতীয়তার উদ্বোধন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি ঐ আন্দোলনের শক্তি এবং দুর্বলতার কারণ সুতীক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কবিরাজ মহাশয়ের মতে শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রাচীন সমাজের নাগপাশ থেকে উত্তরোত্তর মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে। সে সম্পর্কে অনেকগুলি উদাহরণ তিনি আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছেন। তৎসহ তিনি একথাও বলেছেন যে, এই সংস্কার-প্রচেষ্টা গভীরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেনি। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের মূল উৎপাটন করার সম্যক্ চেষ্টা বাঙ্গালী করতে পারে নি। ফলে দেশে যখন স্বাধীনতা এলো তখন সামন্ততন্ত্রের অবশেষস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির দ্বারা আজও আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

অথচ উনবিংশ শতাব্দী, এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ হতেই কৃষক-বিদ্রোহ ক্ষণে ক্ষণে নানা আকারে বাঙ্গলা দেশে ইতস্ততঃ দেখা দিয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে মানুষ সেই স্রোতের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে সমাজে যে বিপ্লব আনা উচিত ছিল, সেটি আনতে পারে নি।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ওয়হবী এবং ফরায়দিয়া আন্দোলন এবং তিতুমীরের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে "মূলতঃ" কৃষক অসন্তোষের আন্দোলন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হ'ল বিচ্ছিন্নতা এবং হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংস্কার চেষ্টা সার্থক হয়নি। এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে ওয়হবী আন্দোলন বা তৎকালের অপরাপর আন্দোলনের বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটু সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

ওয়হবী আন্দোলনের উদ্ভব ভারতবর্ষে হয়নি। ভারতের বাহিরে হয়েছিল। ফরায়দিয়া আন্দোলনের ক্ষেত্র ফরিদপুর জেলায় হলেও তার ভাবের উৎস আরব দেশে সংগৃহীত হয়। ভারতের মুসলিম সমাজ পরাজিত ও রাজ্যহারা হবার পরে তাঁদের মধ্যে একটি সংস্কারচেষ্টা দেখা দেয়। অমুসলমান সমাজ বাঙ্গলায় যখন জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, ন্যাশন্যালিজমের উপাসনা এবং বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর চর্চায় ব্যস্ত তখন ১৮০৩ সালে মুসলিম সমাজে এক ফতোয়া ঘোষিত হয় যে ভারতবর্ষ দারুল ইসলামের পরিবর্তে আজ দারুল হরবে অর্থাৎ শত্রুর এলাকায় পরিণত হয়েছে।

ভারতে ইতিহাসের গতিতে মুসলমান সমাজ নানা আকার ধারণ করেছিল। কেরলের মোপলাদের মধ্যে মাতৃতন্ত্রের অবশেষ দেখা যায়। বোম্বাইয়ের বোরা ও খোজা সম্প্রদায় এতদিন পর্যন্ত হিন্দু উত্তরাধিকার-সূত্রের দ্বারা শাসিত ছিল। পাঞ্জাব বা উত্তর প্রদেশের মুসলমান অভিজাতবংশের বা উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলমানগণ উপজাতিতে বিভক্ত। বিহার ও বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র কৃষক বা কারিগর ও ব্যবসাদার শ্রেণীর অন্তর্গত; আচারে বা ব্যবহারে বহু গ্রাম্য, জাতিভেদদুষ্ট বিধির দ্বারা শাসিত।

এদের সকলকে একত্রিত সংঘবদ্ধ করার জন্য ওয়হবী আন্দোলন কতকাংশে ব্যবহৃত হয়। যদি নিষ্কলঙ্ক ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সমগ্র ভারতের মধ্যে মুসলিম সমাজ নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে: এই নবজীবনের মন্ত্ররচনায়, ইউরোপের ব্যবসাকেন্দ্রিক মেটিরিয়্যালিষ্ট, সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলামের নবজাগরণের যিনি পরে তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করেন তিনি মহাকবি মোহম্মদ ইকবাল। এক সভ্যতার বিরুদ্ধে অপর এক সভ্যতার বিদ্রোহকে আর্থিক ব্যাখ্যা অথবা কৃষকের শোষণনিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ইতিহাসের বিশ্লেষণকে সহজ সরল আকার দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

সারা ভারতে মুসলমান সমাজে যে সকল অনাচার প্রবেশ করেছিল তাকে মুছে মুসলিম নেশন তৈয়ারি করার চেষ্টা যদি শুধু শোষণমুক্তির চেষ্টা হ'ত তা হলে মুসলিম কৃষক অপরাপর শোষিত কৃষকের সঙ্গে একযোটে শোষণবিহীন সমাজ তৈয়ারির চেষ্টা করতো। সেরূপ উদ্দেশ্য থাকলে নিজেরা না পারলে তাদের মুসলিম নেতাগণ অন্ততঃ ঐদিকে মুসলিম চাষীদের পরিচালিত করতেন। কিন্তু তার কোনও লক্ষণ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু ওয়হবী,

ফরায়দিয়া প্রভৃতি আন্দোলন মূলতঃ অর্থনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং উচ্চশ্রেণী মুসলিমের আত্মসংস্কারচেষ্টা এবং খ্রীষ্টান শক্তির নিকটে পরাভবের প্রতিক্রিয়া থেকে সঞ্জাত হয়েছিল সেইজন্য এত সহজে সাম্প্রদায়িকতার অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কেও এ কথা আংশিকভাবে সত্য। আমাদের মন পুরাতন ঐতিহ্যের শাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের চেষ্টা পর্যাপ্ত হয়নি। নরহরি বাবু একথা ঠিকই বলেছেন। তাঁরা কৃষক বিদ্রোহ, আদিবাসীদের বহু বিদ্রোহ, এমন কি সিপাহী বিদ্রোহের আঁচ থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা বরাবর করে চলেছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধী সত্যাগ্রহ শক্তিকে যখন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরাই গান্ধীজীকে ভীতু বলেছেন, বুর্জোয়াদের স্বার্থপোষক বলেছেন। অথচ গান্ধীজীর যুক্তি ছিল; প্রশাসনিক-সংস্কার অথবা হিংসার অস্ত্রপ্রয়োগে যদি ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটে তাহলে বাদশাহের দেহের বা চর্মের রং বদলে যাবে, স্ব-রাজ আসবে না। গান্ধীজী যখন yarn franchise-এর দ্বারা কংগ্রেসকে চাষী বা সাধারণ মানুষের দ্বারা প্লাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা শিশু অবস্থা থেকে ভারতসন্তানকে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মজুরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন তখন আপত্তি মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর কাছ থেকেই এসেছিল। তাঁরা সময়ে সময়ে চাষীর দুর্দশা, আর্থিক কষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ইংরেজ বিতাড়নের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলো তখন ক্ষমতা দরিদ্রতম শ্রেণীর হাতে না এসে অন্য শ্রেণীর হাতে চলে গেল।

ভারত এবং পাকিস্থান দুই রাষ্ট্রে একই ঘটনা ঘটেছে। কেবল দুই ভাইয়ে বাড়ী ভাগ করে নিয়ে যে যার এলাকায় রাজত্ব করছেন। চাষীর মুক্তি এ দেশেও যেমন ও দেশেও তেমনই হয়নি; দুই ক্ষেত্রে তারা প্রসাদভোগী।

ইতিহাসের এই পটভূমিকায় ওয়হবী বা ফরায়দিয়া আন্দোলনকে মূলতঃ অর্থনৈতিক বলা আমার নিকট সমীচীন বলে মনে হয় না।

সে কথা যাক। কিন্তু যে জাতিভেদপ্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিষয় নরহরি বাবু উল্লেখ করেছেন, এবার তার বিচার করা যাক।

ভারতে গ্রামদেশে জাতিভেদপ্রথা সর্বত্র বর্তমান ছিল। স্থান ও কালভেদে তার রূপান্তর অবিরত ঘটেছে, কিন্তু সর্বত্র তার অস্তিত্বের যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া

যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে জুম প্রথায় জঙ্গলে চাষ করে মিজো পাহাড়ে ৩০।৩৫ জন, ওড়িশার কেওঞ্ঝরে ২২।২৪ জনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াবার মত শস্য প্রতি বর্গ মাইল থেকে উৎপাদন করা যায়। সে তুলনায় জাতিভেদ-প্রথায় চাষী, কামার, কুমার, তাঁতী, স্যাকরা, প্রভৃতিতে বিভক্ত সমাজ বর্গ মাইল পিছু বাঙ্গলা বা ওড়িশায় ১৫০ থেকে ৩৫০ লোককে খাওয়াতে পারে। তার অতিরিক্ত লোক হলেই হয় দুর্ভিক্ষে লোক মারা যায়, নয় অনাহারে জীর্ণ হয় নয়তো অন্যত্র মজুরির সন্ধানে যাত্রা করে।

ইংরেজ শাসন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাদের এক নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় হল। সহরে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী বা চাকুরিয়া সম্প্রদায় প্রাচীন উৎপাদন-ব্যবস্থা অর্থাৎ জাতিগত বৃত্তির মোহ কাটিয়ে মুক্তি লাভ করলেন। অনেকে শহরে চাকুরি বা রোজগারের আশায় ভিড় করতে লাগলেন, শিক্ষিত হলেন এবং সমাজে যথোপযুক্ত সংস্কার-প্রচেষ্টাও আনলেন।

কিন্তু ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্রের আওতায় উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন যথোপযুক্ত পরিমাণে ঘটে নি। ইংরেজ নিজের রাজশক্তি প্রয়োগে, নিজের জাতি ও সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার্থ আমাদের আর্থিক উন্নতির পথে বাধা সৃজন করেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, যারা বাঙ্গালীর মধ্যে শহরের বাসিন্দা হলেন তাঁরা জাতিপঞ্চায়ৎ বা গ্রাম্য সমাজশাসনবিধিকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিত্যাগ করে নূতন নূতন বৃত্তি অনুযায়ী, যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন, মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি গড়তে পারেন নি। শহরে সমাজের মধ্যে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তাঁরা গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে ঝরা পাতার মত ঝরে দিতে দেন নি।

আজও কলিকাতা শহরে যতগুলি ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তাদের পরীক্ষা করলে এক বিচিত্র তথ্য প্রকাশিত হয়। অধিকাংশই ট্রেড ইউনিয়ন "গড়ার কাজের" চেয়ে সংগ্রামাত্মক কাজে বেশী ঝোঁক দেয়। বিভিন্ন পার্টি সংগ্রামে কত বেশী আগুয়ান হতে পারে তারই প্রতিযোগিতা করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম বা বিহারী-বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সক্রিয়ভাবে এই বিরুদ্ধশক্তির প্রতিরোধ করতে পারে না।

কোনও গ্রামে যদি ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা না থকে তাহলে গাঁয়ের

লোক যদি জড়িবুটি বা পাচনের উপরে নির্ভর করে তাহলে তাদের "সংরক্ষণশীল" বলা কি উচিত হবে? একশত পঞ্চাশ বৎসর ধরে শিক্ষিত বাঙ্গালী শহুরে জীবনের উপযোগী, নূতন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত সংখ্যায় না গড়ে থাকে, লোকে যদি সামনে অন্ধকার দেখে আশ্রয়ের লোভে জাতভাইয়ের সঙ্গে দল পাকায় তাহলে তাদের সংরক্ষণশীল বলা উচিত, না এ কথা বলা উচিত যে, শিক্ষিত শহুরে শ্রেণী অবশিষ্ট মানবসমাজ থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যে নূতন জীবনের দায়িত্ব, তারা সম্যক্‌ভাবে পরিপালন করে নি, নূতন সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলতে পারে নি? হিন্দুসমাজের স্থিতিশীলতার জন্য এ দুর্দশা ঘটে নি। শিক্ষিত শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যই এটা ঘটেছে।

শ্রীযুক্ত সুনীল সেনগুপ্ত আমাদের নিকট অত্যন্ত গভীর তত্ত্বের পরিবেষণ করেছেন। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিভাবে অগণিত কৃষকবৃন্দের স্বার্থকে বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থপুষ্টি সাধন করেছে, তারই একটি তথ্যময় বৃত্তান্ত তিনি সভায় উপস্থাপিত করেছেন। সেজন্য আমরা সকলে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানিচয়ের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বলেছেন যে আর্থিক ক্ষেত্রেই হোক বা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক, যদি বিদেশী সহায়তা আমাদের গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয় তাহলে সমাজবাদী দেশের নিকটেই তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে নয়। এবিষয়ে আমরা তাঁর মতের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ভারতে টাটা-বিড়লা প্ল্যান, শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্ল্যান, ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্ল্যান থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন ভারতের পর পর চারটি প্ল্যানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তিনটি পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের কার্য সমাধা করে আমরা চতুর্থ প্ল্যানে পদার্পণ করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী ভারতবাসীকে ১৯২১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার বিচার বা বিশ্লেষণ বিদগ্ধ সমাজে সহজে শুনতে পাওয়া যায় না।

১৯৩৯ সালে বোম্বাই কংগ্রেসের প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষবাবুর উদ্যোগেই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে সুভাষবাবু বিজ্ঞানসম্মত প্ল্যান নির্মাণের কথা প্রথম উত্থাপন করেন। পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে একদিকে কে-টি-সাহ, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি ছিলেন অপরদিকে

গান্ধীবাদী জে-সি-কুমারাপ্পা এবং সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ও ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দুই পক্ষের মতামতের মধ্যে বিরোধ বাধে। তখন গান্ধীবাদী দুইজন এবং পণ্ডিতজী গান্ধীজীর নিকটে উপদেশের জন্য যান।

গান্ধীজী দুইপক্ষের কথা শোনেন। বিজ্ঞানসম্মত উন্নত যন্ত্রযোগে উৎপাদন এবং কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদনের মধ্যে কিসের উপরে সমিতি কতখানি গুরুত্ব আরোপ করবে সে বিষয়ে তাঁকে বিচাব করতে বলা হয়। সমস্ত শুনে তিনি উভয় পক্ষকে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্ল্যান রচনার উপদেশ দেন। দুটিকে যেন-তেন-প্রকারেণ যুড়ে এক বর্ণসংকর প্ল্যান কবতে নিষেধ করেন। কিন্তু তৎসহ তিনি উভয়কেই বলেন যে তিনটি সর্ত মেনে নিতে হবে :

১। বিদেশ থেকে কোনও টাকা ধার করা চলবে না।

পণ্ডিতজী অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন, তবে টাকা আসবে কোথা থেকে? উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন সমস্ত ভারতবাসীর টাকা জাতীয় উন্নয়নের জন্য আকর্ষণ করতে হবে। ব্যক্তিবিশেষের পকেটে, মঠে মন্দিরে যে-কোনও সম্পদ সঞ্চিত আছে, তাকে এই জন্য নিযুক্ত করতে হবে। সে টাকা কি ভাবে গভর্নমেণ্টের আয়ত্তে আসবে—বাজেয়াপ্ত করে বা অন্য উপায়ে—সে কথা স্বতন্ত্র। সেটি উপায়ের প্রশ্ন, লক্ষ্যের প্রশ্ন নয়।

২। জনসাধাবণের জন্য জীবনের একই মানে উভয় পক্ষকে পৌছতে হবে।

৩। কত বৎসর লাগবে তাও যেন সমিতি চিন্তা করেন। যদি দেখা যায় কুটিরশিল্পের মারফৎ অস্বাভাবিক রকমের সময় লাগছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক কম, তাহলে কুটিরশিল্প পরিহার করতে হবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যদি সামান্য ইতরবিশেষ হয়, তাহলে তিনি বিকেন্দ্রীকরণের প্ল্যানকেই পছন্দ করবেন।

আমার বক্তব্য এই যে আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপরে নির্ভব করে কোনও প্ল্যান করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। সেই চেষ্টা যদি আমরা শেষ পর্যন্ত করেও দেখি, অপবের সহায়তার প্রয়োজন, তখন আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের কাছে ঋণ প্রার্থনা করতে পারি। আজ যেভাবে আমেরিকা, জার্মানি, ইয়ুগোস্লাভিয়া, জাপান, বা সোভিয়েৎ রুশের নিকট নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার না করেই আমরা দশভুজা ভিখারিণীর বেশে দাঁড়িয়েছি তাতে সমগ্র জাতির মাথা লজ্জায় অবনত হওয়া উচিত।

প্ল্যানিং সম্পর্কে বিশ্লেষণকালে কপিলবাবু শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে

ব্যবধানের উল্লেখও করেছেন। শিক্ষিতজন সত্য সত্যই গ্রামের চাষীর সমস্যা সম্যক্‌ভাবে অনুভব করেন না, এবিষয়ে তিনি অভিযোগও করেছেন। সে অভিযোগ সমীচীন হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচি মহাশয় শিক্ষাব্যবস্থার যে সারগর্ভ বিশ্লেষণ করেছেন সেটি আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঠিকই বলেছেন যে সর্বস্তরের সর্বলোকের মধ্যে গণ-শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে আমাদের সরকার শ্রেণীবিশেষের শিক্ষার উন্নতিসাধনেই যেন সমধিক ব্যস্ত। তাঁর বিশ্লেষণ এবং অভিযোগ সঙ্গত হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী ১৯৩৯ সালের বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা শিশুকাল থেকে নূতন ভারতসন্তানকে যে-ভাবে স্বাবলম্বী, শিক্ষিত মজুরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন, যেভাবে সর্বভারতে সহজে, অল্প খরচে শিক্ষানিকেতন স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, অনেকের দৃষ্টিতে সে প্রচেষ্টার মর্ম ধরা পড়ে নি। শ্রীযুক্ত জিন্না, মৌলভি ফজলুল হক্ প্রভৃতি, এবং ভারতের লিবারেল রাজনীতিজ্ঞ-গণের পক্ষ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা ও ওয়ার্ধা প্রস্তাবের তীব্র বিরুদ্ধতা করা হয়। গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথা বা শ্রেণীভেদ বিনষ্ট করে সকলেরই শূদ্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, অতএব তার বিরুদ্ধাচরণ স্বাভাবিক। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার এই যে ভারতের জনসাধারণের মুক্তিকামী শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টার মর্ম ধরা পড়ে নি। হয়ত চরকাকে আশ্রয় করে শিক্ষাব্যবস্থা সৃজন হয়েছিল বলেই তাঁদের কাছে গান্ধীজীর নব শিক্ষাব্যবস্থা অস্পৃশ্যতাদোষে দুষ্ট হয়ে রইল।

অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচি মহাশয় অতি সঙ্গতভাবে শিক্ষার বাহনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। মাতৃভাষার আশ্রয় ছাড়া প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার হয় না, এবিষয়ে আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে সহমত। কিন্তু সমস্যা কি শুধু বাহন বা ভাষার সমস্যা। আমি সম্প্রতি নীচু ক্লাশে পড়াবার জন্য "সাধারণ জ্ঞান" নামে একশ্রেণীর বই সংগ্রহ করেছি। তাতে ৬।৭।৮ বছরের বালকবালিকাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য লেখা আছে—আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা কত, কোন্ জন্তু দাঁড়িয়ে ঘুমায়, কোন জন্তুর চোখের পাতা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি এই ভেবে যে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পথে কি এই সকল প্রশ্নের উদয় হয়? জিরাফের গলার মেরুদণ্ডে কটা হাড় আছে, এ প্রশ্ন তার মনে আসা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাইক্ল পাংচার হয়ে গেলে কেন চালানো যায় না, এটা হয়ত

স্বাভাবিক প্রশ্ন। আমার বক্তব্য হল, বালকবালিকার স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিকে জাগ্রত না করে, কিভাবে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমরা প্রশ্নের উত্তর লাভ করতে পারি, সে কথা না শিখিয়ে কয়েকটি তথ্য মুখস্ত করালেই কি সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে? ইংরেজীর বদলে বাঙ্গালায় সেই জ্ঞান বিতরণ করাই কি পর্যাপ্ত হবে?

আর সে বাঙ্গলাই বা কি অভিনব। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে মনে ইংরেজীতে অনুবাদ করে তবে তার অর্থাগম হয়। চেহারায় বাঙ্গলার মত দেখালেই একটা ভাষা বাঙ্গলা ভাষা হয় না। অধ্যপক নির্মাল্য বাগচি মহাশয়ের সঙ্গে সহমত হয়ে আমি এইটুকু সতর্কতার বাণী তাঁর উক্তির সঙ্গে যুড়ে দিতে চাই।

সর্বশেষে বন্ধুবর গোপাল হালদার মহাশয় আমাদেব যে ভাষণ দিয়েছেন তার জন্য আমি সর্বজনের পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি গভীর বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন কী ভাবে সংস্কৃতির মধ্যে মানবিকতা, বা কখনও অতিমানবিকতাকে আশ্রয় করে বিচ্ছিন্নতার উদয় হয়। যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার চেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধতা মানবসমাজকে বারবার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সর্বোপরি সামগ্রিকতার বোধ থেকেই আমরা যেন ভ্রষ্ট হতে বসেছি। ফলে যে অপূর্ণ বিপ্লব সমাজের ক্ষেত্রে এবং আমাদের মানসলোকে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, সেটি ঘটছে না। সমাজ ও জীবন পঙ্গু বলে, বর্তমান যুগোপযোগী পদচারণের পথে আমরা খঞ্জের মত চলতে বাধ্য হয়েছি।

তাঁর উপরোক্ত সতর্কবাণীর জন্য আমি বিশেষভাবে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বশেষে আজকের বক্তৃতামালার মধ্যে একটি বিশেষত্বের সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গের আলোচনান্তে আজ সান্ধ্য সভা সমাপ্ত হবে।

বন্ধুবর কপিল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচি এবং শ্রীযুক্ত সুনীল সেনগুপ্তের বক্তৃতার মধ্যে আভাসে একটি দাবি অনবরত প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের শাসনব্যবস্থা সম্যক্ পথে পরিচালিত হচ্ছে না, উচ্চশ্রেণীর বা মধ্যশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্যই তা প্রযুক্ত হচ্ছে, কৃষক বা শ্রমজীবীদের স্বার্থপুষ্টি তার প্রধান

লক্ষ্য নয়। রাষ্ট্রশক্তির লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে আমার সংশয় নাই।

কিন্তু একটি ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি গান্ধী, টলস্টয় বা ক্রোপ্টকিনের ভাবধারার দ্বারা পুষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের কাল হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজসেবা অথবা সংস্কারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপরে নির্ভরশীল ছিল না। নিজের শক্তি অনুযায়ী ছোট ছোট মানুষ সংবদ্ধভাবে শক্তি সম্মিলিত করে জীবনের বহু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। তারা রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করে নি। কিন্তু তারই উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে নি।

বিচিত্র কথা এই যে, রুশ বিপ্লবের পরে, আনুমানিক ১৯২৮-২৯ সাল থেকে ভারতে একটি নবমন্ত্রের জপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালের পরে এই মন্ত্রের আবেশে আমাদের দেশ যেন একান্তভাবে বিহ্বল হয়ে গেছে। মন্ত্রটি এই যে, সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রের মাধ্যমে দ্রুত সুসম্পন্ন করা যায়। গান্ধীবাদী টলস্টয়ের অনুগামী হিসাবে আমি এটিকে অন্ধবিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করি। রাষ্ট্রের উপরে এই নিভরশীলতার বিরুদ্ধে টলস্টয় একটি পুস্তিকা লিখে তার নাম দেন 'The Slavery of Our Times'।

বন্ধুবর কপিল ভট্টাচার্য ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় শক্তির আয়ত্তে আনার বিষয়ে প্রস্তাব করেছেন। অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচি শিক্ষাধিকরণে সংস্কারের বিষয়ে বলেছেন। সুনীলবাবুও ভূমিসংস্কারের কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে কৃষকের মুক্তি সম্ভব সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নাই একথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। অথবা জাগ্রত জনমতের প্রতিফলন রাষ্ট্র বা আইনের ক্ষেত্রে হওয়া অনাবশ্যক একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সকল জীবনধর্ম রাজধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হো'ক ; রাজকর্মচারীগণই জনগণের প্রয়োজনের একমাত্র প্রতিভূ হ'ন ; আমাদের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সবই রাজানুশাসনের বশবর্তী হো'ক, এটা আমার কাছে আদৌ কাম্য মনে হয় না।

আজ যে সরকার চাল, চিনি, মাছ বিতরণ, পরিবহন বা অন্যান্য নানাবিধ আর্থিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে আরও কিছু দায়িত্ব তার উপরে চাপাতে আমার আপত্তি আছে। যে ঘোড়া তিন মন মাল বহন

করতে পারে না, তার উপরে আরও পাঁচ মন মাল চাপানোর পক্ষপাতী আমি নই। যে-কোনও উপায়ে জীবনের সকল দিককে রাষ্ট্রেরও আয়ত্তাধীন করলেই যে সোস্যালিজমের ভিত্তিনির্মাণ হয়ে যাবে এই কুসংস্কারে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রাধীন করলে স্টেট ক্যাপিট্যালিজম-ও তো হতে পারে। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন বা কলিকাতার পরিবহন ব্যবস্থা এমন কি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞান-গবেষণার বিভাগগুলিতে যে পরিমাণ আর্থিক অপচয় ঘটে, যত বেশী খরচে যত কম কাজ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করলে আমাদের এই কুসংস্কারের কুজ্‌ঝটিকা কিঞ্চিৎ বিদূরিত হতে পারে।

তবে কি রাষ্ট্রশক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজে পরিবর্তন আসবে? রাষ্ট্রযন্ত্রের লক্ষ্য বা পরিচালনব্যবস্থায় কোন সংস্কারের প্রয়োজন নাই?

নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মনের তলায় নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমি বিনীতভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করছি যে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের সমসমাজ গঠন করার বহুবিধ ছোট ছোট প্রচেষ্টা সর্বত্র ফুটে উঠলে তখনই রাষ্ট্রকে সুপথে চালিত করা সম্ভব হবে। তৎপূর্বে নয়। এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপর প্রকারের প্রতিষ্ঠানের বিকাশ নয়, একে অপরের পূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, পরিবর্ধনশীল হবে।

জগতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য রুশ বা চীনে দেখে আমরা বিহ্বল হয়ে গেছি। এই বিহ্বলতার নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্তিলাভের প্রয়োজন আছে। এবং সে প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উভয় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করুক, এই নিবেদনান্তে আজকের সান্ধ্য-সভায় সকলকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার কার্য সমাপ্ত করছি।

পরিশিষ্ট

THE CRISIS IN BENGALI*

We are men of small stature but faced with big problems. There is the problem of securing adequate food for the people and of its even distribution. There is the problem of combating inflation. And we are also committed as a nation to the task of establishing socialism by democratic means. These are great tasks and great commitments. Yet it is strange that in the present crisis in West Bengal, political parties, almost without exception, seem to have abdicated their *leadership*, and allowed the people to take the law into their own hands. The reaction of various political parties to this crisis holds an important lesson for all those who believe in the ideals which the nation has set before itself.

On the one hand, there are the crowds of people whose immediate aim seems to be to destroy public property and make it impossible for the government to rule or the economic life of the people to function for the time being. It does not seem to be their concern as to what will eventually happen or who will lead. On the other hand, there are leaders of parties who see in the behaviour of these crowds the promise of a future revolution. Some of them want the central government to step in, displace whatever democracy there exists at the state level, and set everything right by rushing economic assistance to Bengal. Some have expressed the desire that the present Ministry in Bengal should be dissolved, and President's rule introduced in its place.

To one who is politically committed to the Gandhian ideal of democracy, this seems to be a strange state of affairs.

The crowds, by their violent outbursts, and the leaders of some parties by their direct or indirect support of central interference are voting for an absolute dependence on governmental authority for setting right the ills of society. In the streets or in small assemblies of educated men and women, one often hears the remark that if the government is to rule it must rule *strongly*. This left-handed way of voting for totalitarianism may satisfy those who believe that the "Revolution" can only come through a violent overthrow of central authority. A decentralized and widely shared political authority does not offer immediate scope for overthrow by tactical manipulation at one point alone.

A similar situation arose in Bengal and the rest of North India during the communal disturbances of 1946-47. All political parties felt that they were incapable of dealing with the communal riots. Many statements for the restoration of peace and unity were made by political leaders through the Press, but it had little effect upon those who stood in battle array either in the city streets or village lanes in Bengal or Bihar. There was a virtual abdication of leadership ; and a demand that the administration, aided by the military, should restore peace in the land. Power and control became highly centralized, and voluntary or democratic institutions practically ceased to function. And partition of the country become a reality because, at the centre, the Congress and Muslim League leaders could not come to terms and allowed the British to help them in parting company with one another.

A parallel situation seems to be developing in West Bengal today. We do not yet know in which direction this virtual suspension of democracy will lead us either in the immediate future or in the coming general election of 1967. Let us only hope it will not lead to the worst. But it is imperative that those who have faith in the democratic way to socialism should strengthen democracy rather than weaken it in any way.

It is distressing to find that some responsible newspapers and political leaders should refuse to depend on or help the democratically elected government of West Bengal, and its Chief Minister in particular, in restoring peace in this state. In 1946-47, when the Muslim League was in power in Bengal, Gandhiji thought it wise to work through that government to bring peace and order in Noakhali. At that moment, he was also trying to set things right in Bihar through the Congress government of that state. He did not want to treat the two governments differently ; obviously because his aim was not to bring to an end the Provincial Autonomy which existed at the time. He therefore worked with and through the then Chief Minister of Bengal, even though there were sound reasons for believing that the latter had done everything to strengthen the Muslim League rather than democracy in the state of which he was in charge.

It must however be recalled that Gandhiji did not merely rely upon the administration to restore peace in the land. He tried to enlist volunteers, build up teams of men and women who would face the worst possibilities and prepare the ground so that a democratic administration might serve the best interests of the people.

The above holds an important lesson for us in the present crisis in Bengal. For the sake of democracy, we ought to see to it that administrative power is not centralized more and more. We should not merely say that the military should not be called whenever the local administration finds itself in a difficult situation. But we must strengthen voluntary organizations in the shape of the party machinery, or even build up volunteer corps to supplement the endeavours of the state government to deal with our many-sided problems. Even if military assistance is called for by the

state government, the people must demand that it should function wholly under civil authority.

The Government of West Bengal today may be suffering from its own difficulties in regard to the procurement and distribution of food. Its administrative machinery undoubtedly needs adequate reform ; the economic policies such as those dealing with land reform, or procurement and storage of foodgrains may have to be considerably modified. But it is wrong for the people, their leaders and the various voluntary institutions to leave everything completely in the hands of administration, and allow the latter to break down under its self-chosen burden. Would it not be better for democracy to assert itself by setting up its own organizations at the popular level to secure adequate food and ensure fair distribution with the aid of the government rather than ask the government to do everything ?

If democracy fails us at this moment of crisis, we may retain its outer shell only for the time being, but, willingly or unwillingly, prepare the way for totalitarianism, no matter whether that is of the Right or of the Left variety.

Should we not try to save ourselves from that eventuality even if the crisis is deep today ? It is true we are men of small stature. But should we wait for a miracle to happen in our midst, should we rely upon magic rather than intelligent co-operation in order to bring about what we desire ?

THE CLIMATE OF UNREST*

Recent happenings in Calcutta should lead to heart-searching among citizens, and not to a sense of complacency after the disturbances have subsided.

If it has shown up anything, it has at least demonstrated three things : (a) A comparatively small band of determined men can throw the whole life of a city out of gear. (b) Those who are not in favour of disturbances cannot combine forces, They feel helpless before a temporary preponderance of forces on the other side. The battle for peace is thus lost. There is a widespread sense of frustration and a lack of confidence in the administration, no matter whether it is justified or unjustified, no matter what the origin of such frustration may be. Those who suffer from this feeling contribute to the destructive climate by playing the part of dissatisfied neutrals.

Production :

Regulation of prices is necessary ; but it is closely tied up with production.

At one time, the Government of West Bengal seemed to have favoured small-scale irrigation schemes, encouragement of composting, etc. But the programme was obviously abandoned at a later stage. Probably this was the result of increasing emphasis on large-scale river-valley projects, and of the difficulties experienced in working out small irrigation schemes, which are difficulties inherent in decentralization and in the promotion of local initiative.

Yet the only way of building up democracy is to build it up from the grass-roots under situations of the above kind. Part of the failure of small-scale irrigation schemes was obviously due to the haste to get many things done in many places in a short time without adequate caution in selection and organization. Haste may often lead to waste.

It is suggested that *where dependable workers are present*, small-scale irrigation projects should be given a determined trial. If difficulties arise, they should be faced with a determination to change methods and *win*. (Gandhiji made even spinning a success by attending to all technical and organizational difficulties as they arose from time to time. He worked like a skilled surgeon.)

After methods have been perfected, work should be multiplied.

This may need putting the portfolio of agriculture into the most skilful hands. The Minister of Agriculture should be assisted either officially or non-officially by experienced people (in agriculture), having missionary enthusiasm as well as progressive ideas.

The question of agricultural credit is of very great importance. It has to be supplied, and if in spite of the best efforts, there is some waste, this should not deter the machinery from supplying credit.

Efficiency is now partly injured by deficiency of supply. If many people cannot be supplied with credit, let the Government modestly limit itself to a small number of battlefields where victory must be won, and then followed by a phase of multiplication.

Distribution :

The Government has set up fair-price shops. Even these can be turned into instruments of popular organization. Perhaps there is no quarter in the city without some kind of local leadership, whether formal or informal. A retired schoolmaster or official or perhaps someone else may be found whom the people respect for integrity and honesty, and who can be induced to or is willing to spare time in order to see that distribution is properly maintained in his locality.

Workers may be organized under his leadership in order to collect information on the needs of different families by means of house-to-house visits ; and the information may be utilized for ensuring that supplies reach the most needy before reaching other quarters.

Such workers should preferably be gathered from among local people, no matter to which institution they belong, provided they are willing to work under the local leader whom most people respect.

Cells :

At one time M. N. Roy submitted a proposal for the creation of "cells" in every locality as a part of the Congress organization. The purpose was not so much to allow them to become cells of "power" as to use them for constant discussion and appraisal of ideas and programmes proposed by the Congress.

After independence, all remedies of our ills, whether economic or otherwise, are sought at the official level. Problems of nation-building have been converted into "administrative problems" in the main. Public support is sought for, but as a supplement. It seems no longer to be the business of the Congress organization to promote development of local initiative. It might however be argued that the present extreme reliance upon the Administration is a passing phase in our national experience.

It is dangerous to burden a government with so heavy a task, and in a country inhabited by one-seventh of the world's population. Such a process should be avoided, even if it is only for the following reason. The Government of India is not in a position to remedy with reasonable rapidity all the ills of a nation which was suffered from several centuries of servitude and impoverishment. Conditions all round the world are also not propitious.

If the impossible is demanded of the Government, and there is no fulfilment, this may easily lead to frustration, negative neutralism and a resulting climate of destructiveness when a critical situation arises.

This may be a major reason why local initiative should be promoted and organized in order to solve the numerous problems of social and economic life. The secret of success lies in our ability to deal efficiently with situatitons as they arise at the local level and in combining with it services made available by the Government in a manner so that local initiative is not scotched, but encouraged and fortified.

It is all a question of education and organization, where the aims are set sufficiently high.